ফিলিস্তিনী সমস্যার পটভূমি

আকমল হোসেন

'মুরগির একটি ঘর আছে, অথচ আমার তা নেই' - উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাসকারী একজন ফিলিস্তিনী বৃদ্ধ ব্যক্তি সীমান্তের অপর পারে ফেলে আসা তার মাতৃভূমির দিকে তাকিয়ে একদা যে উচ্চারণ করেছিলেন তা ছিল একটি প্রতীকী মনোভাব। আজ চুয়ান্ন বছর পার হয়েও তা প্রতীকই রয়ে গেছে। ফিলিস্তিনীর ঘর মেলে নাই। নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়েই রয়েছে সে। তার মাটি থেকে একদা যারা তাকে উৎখাত করল তারা হয়ে বসেছে বৈধ, আর সে অবৈধ। আধুনিক মানব ইতিহাসে এরকম অন্যায়ের উদাহরণ আর একটি মিলবে না। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন নতুন কত দেশ তাদের স্বপরিচয়ে জায়গা করে নিল, রাজনৈতিক পরিচয়ে কত বড় দেশ ভেঙ্গে নতুন অনেক দেশ তৈরি হলো, শুধু ফিলিস্তিনীরা, যাদের এক সময় নিজস্ব ভূখন্ড ছিল, স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল, ইতিহাস ছিল, তারা হারিয়েছে ভূখন্ড, তাদের পরিচয় হয়েছে হয় ইসরাইলী নাগরিক অথবা শিবিরে বসবাসকারী উদ্বাস্তু এবং তাদের বর্তমান ইতিহাস রক্ত ঝরানোর স্বজন হারানোর ইতিহাস।

ফিলিস্তিনী জনগণ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আন্তর্জাতিক শঠতার শিকার হয়েছে। পরে পশু শক্তির আক্রমনে নিজস্ব স্বাধীনতা হারিয়ে আন্তর্জাতিক উদাসিনতার বিষয় হয়েছে। নিজেরা এক সময় সংগঠিত হয়ে অস্ত্র হাতে লড়াই শুরু করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি টানতে সক্ষম হলেও তা শেষ পর্যন্ত আরাধ্য নিজস্ব রাষ্ট্র অর্জন করতে সাহায্য করেনি। বাধ্য হয়ে যখন অস্ত্রের পরিবর্তে কূটনৈতিক আলোচনাকে একমাত্র উপায় বেছে নিয়েছে তখনও তাদের জন্য হতাশা-বঞ্চনা ছাড়া আর কিছু মেলেনি। এরপর রাস্তায় ধাবমান ইসরাইলী সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ি ও সেনাদের শুধু পাথর হাতে মোকাবেলার এক পর্যায়ে ফিলিস্তিনী তরুন-যুবারা যখন নিজেদের মানব বোমায় পরিনত করল, তাদের ভাগ্যে জুটল সন্ত্রাসী অভিধা।

জিয়নবাদী চক্রান্তে ১৯৪৮ সালে নিজ ভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার ভিতর দিয়ে ফিলিস্তিন সমস্যার উৎপত্তি হলেও এর পটভূমি আরও বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জিয়নবাদী রাষ্ট্রটির জন্ম হলেও জিয়নবাদী নেতৃত্বের তৎপরতা শুরু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। ফিলিস্তিন সমস্যার ইতিহাসকে তাই কয়েকটি পর্বে ভাগ করে দেখলে এর ক্রমবিকাশটি পরিস্কার হবে।

থিওডোর হারজেল, জিয়নবাদের গুরু

যে ভূখন্ডটি বর্তমান ইসরাইল, ইতিহাসে এটি পর পর বিভিন্ন জাতির নিয়ন্ত্রনে থেকেছে। কোন জাতিই চিরস্থায়ীভাবে তাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। ইহুদি ধর্মানুসারিরা খ্রিষ্টের জন্মের আগে ৬ষ্ঠ শতকে রোমানদের হাতে পরাজিত হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পৃথিবীর নানান দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর সর্বশেষ বাসিন্দা ফিলিস্তিন আরব জনগোষ্ঠী জিয়নবাদী ইহুদিদের হামলার মুখে এর উপর তাদের নিয়ন্ত্রন হারায়। তবে ইহুদিরা দীর্ঘ ২ হাজারের বেশি বছর সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাস (এ সময়কালকে বলা হয়েছে Diaspora) করেও তাদের মাতৃভূমি হিসাবে বিবেচনা করেনি। তারা বংশ পরম্পরায় বিশ্বাস করেছে যে তাদের ছেড়ে আসা মাটিতে আবার তারা ফিরে যাবে কারণ, ইশ্বর তাদের সেই অঙ্গীকার করেছেন। তাদের বিশ্বাসের কারণে তারা ২ হাজার বছরেও তদের জীবনযাপন, ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কৃতি - কিছুই ছাড়েনি। মধ্য যুগের ইউরোপে খ্রিষ্টান ধর্ম বিশ্বাসীদের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারেনি। মার্চেন্ট অভ ভেনিস নাটকে সেক্সপিয়ার শাইলকের যে চরিত্র একেছিলেন এক কুটিল ইহুদি হিসাবে তা খ্রিষ্টান-ইহুদি সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরে। উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্য ইউরোপে ইহুদি-খ্রিষ্টান দাঙ্গাহাঙ্গমার ঘটনা ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের তাদের পরচিত মাটির প্রতি সংশয়াকুল করে তুলেছিল। সর্বশেষ জার্মানীতে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে নিকৃষ্ট জীব গণ্য করে হিটলারের ইহুদি নিধন কাজ তাদের সমস্যার মানবিক দিকটি তুলে ধরেছিল।

ইহুদিদের Diaspora কালের এক পর্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে অস্ত্রীয় ইহুদি থিওডোর হারজেলের দৃশ্যপটে আগমন ঘটে। তাকে জিয়নবাদ (ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ)-এর পিতা বলা হয় যেহেতু তিনি ইহুদিদের এক পৃথক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা প্রথম উপলব্ধি করেন এবং সে দাবিতে তাদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন। তার যুক্তিকে তুলে ধরতে তিনি The Jewish State (১৮৯৬) নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। একই সাথে হারজেল রাজনৈতিকভাবে তাদের দাবি পেশের জন্য বিভিন্ন সময় ইহুদিদের কংগ্রেস অনুষ্ঠান করেন যেখান থেকে ইউরোপের রাজন্যবর্গের কাছে তাদের দাবির স্বপক্ষে আর্জি পাঠান হয়। হারজেলের মৃত্যুর পর তার প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের কাজ থেমে যায়নি। বরং ইহুদি রাষ্ট্রের ভূমি হিসাবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভিন্ন ভূখন্ডকে প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের উপর তাদের দাবিকে কেন্দ্রিভূত করা হয়। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জোরালো হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে ইহুদি রাষ্ট্রের দাবির প্রতি ব্রিটিশ নীতি সুস্পষ্ট হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে যাতায়েতের সহজ পথ এবং পরবর্তীতে সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু ফিলিস্তিন যেহেতু তখনও অটোমান তুর্কী নিয়ন্ত্রিত ভূখন্ড, ব্রিটিশদের পক্ষে সেসময় যে সব ইহুদি ইউরোপে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়ে অন্য কোথাও বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছিল তাদের ফিলিস্তিনে বসতি করতে সাহায্য প্রদান ছাড়া অন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

আরবদের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রতারনা, বেলফোর ঘোষণা ও লীগের ম্যান্ডেট ব্যবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান তুর্কিরা জার্মানদের পক্ষাবলম্বন করায় ব্রিটিশদের সঙ্গে তাদের শত্রুতার সম্পর্ক তৈরি হয়। তুর্কিদের ঔপনিবেশিক শাসনে পিষ্ট আরব জাতি স্বাধীন হওয়ার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম শুরু করেছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন গড়ে কাজ করে যাচ্ছিল। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগেই আরব জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে কি ভুমিকা নিতে পারে সে ব্যাপারে ব্রিটিশরা আলোচনা শুরু করে। হেজাজের শাসক শেরিফ হুসেনের সাথে ১৯১৪-১৫ সালে এক পত্রালাপ মারফত মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার হেনরি ম্যাকমোহন তার সরকারের পক্ষে যুদ্ধ শেষে আরবদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন। তার প্রতিশ্রুত স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে শুধুমাত্র দামেস্ক নগরির পশ্চিম পাশে অবস্থিত কিছু এলাকা ব্যতীত হুসেন

প্রস্তাবিত সব এলাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিদানে সমঝোতা অনুযায়ী যুদ্ধে আরবদের তুর্কীদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করার কথা ছিল। আরবগণ তা পালনও করেছিল তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করে। কিন্তু ব্রিটিশরা আরবদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগেই বাস্তবে ফরাসীদের সঙ্গে গোপন চুক্তির (Sykes-Picot Agreement) বদৌলতে সমগ্র আরবভূমি নিজেদের ভিতর ভাগাভাগির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিল। পাশাপাশি তারা জিয়নবাদীদের জঙ্গি গ্রুপ সংগঠনের উদ্দেশ্যে তাদের সহায়তা দিচ্ছিল। ১৯১৫ সালে আলেকজ্রান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশ কমান্ডের অধীন একটি ইহুদি ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয়। আরবদের স্বাধীনতা স্বপ্ন সবচেয়ে করুন পরিনতি লাভ করে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর যখন এক পত্রে ব্রিটিশ জিয়নবাদী নেতাকে যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য এক 'জাতীয় আবাসভূমি' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। বেলফোর ঘোষণা দিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাসভূমির যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো তা হোসেন-ম্যাকমোহন সমঝোতার শুধু বরখেলাপই নয়, সময়ের নিরিখে পরে সংঘটিত ঘটনা হওয়ায় তা অগ্রাধিকার হিসাবে গণ্য হতে পারেনা।

এসব প্রমাণ করে যে ইংরেজগণ আরবদের স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা বাস্তবে শঠতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। বেলফোর ঘোষনা দ্বারা ব্রিটিশ সরকার যেমন জিয়নবাদীদের তাদের আবাসভূমির ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পেরেছিল অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ইহুদি সমর্থন নিশ্চিত করা গিয়েছিল। এ কথার প্রমাণ মেলে ১৯৩৭ সালে ব্রিটেনের হাউস অভ কমনস্-এ চার্চিলের বক্তব্য হতে: বেলফোর ঘোষণা যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের বিজয়ের লক্ষ্যে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা গিয়েছিল। বাস্তবে আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায় যুদ্ধে ব্রিটিশদের সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিল।

ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা দাবি অবজ্ঞা করা হয় যখন ব্রিটিশরা লীগ অভ নেশনস-এর পক্ষ থেকে ফিলিস্তিন ভূখন্ড শাসন করার ম্যান্ডেট লাভ করে লীগ সনদ অনুযায়ী। যে ম্যান্ডেট ব্যবস্থা চালু হয় ১৯২০ সালে, সনদ অনুযায়ী সাবেক জার্মান ও তুর্কী উপনিবেশ গুলোকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে চালিত করার জন্য তা একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনপদ্ধতি ছিল। সনদ অনুযায়ী এসব ভূখন্ডকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করার জন্য তাদের আরো কিছু সময় 'অগ্রসর জাতির' অভিভাবকত্বে থাকতে হবে। কিন্তু ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে বাস্তবে তা হয়ে দাঁড়ায় বেলফোর ঘোষণা অনুসারে জিয়নবাদীদের আবাসভূমি বাস্তবায়নের উপায়। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন এক আন্ত:মৈত্রি কমিশনের দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে এর ভবিষ্যৎ মর্যাদার ব্যাপারে জনগণের মতামত সংগ্রহের প্রস্তাব দিলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার এ জাতীয় কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে আপত্তি তোলে। পরবর্তীতে ২ সদস্য বিশিষ্ট এক মার্কিন কমিশন (কিং-ক্রেন কমিশিন) এ এলাকা পরিদর্শন শেষে ইহুদিদের আবাসভূমি সমপর্কে যে মন্তব্য করে তা বেলফোর ঘোষণার উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনে প্রাথমিকভাবে ইহুদি অভিবাসন নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করলেও মার্কিন চাপ ও জিয়নবাদীদের সহিংস কার্যকলাপের ফলে তা করতে পারেনি। জিয়নবাদীরা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল। পাশাপাশি ইংরেজ ও ফিলিস্তিন আরবদের ভীত করে তোলার জন্য তারা সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলে যারা সন্ত্রাস ছড়িয়ে কাজ উদ্ধার করতে পিছিয়ে ছিল না।

ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা, ফিলিস্তিনী লড়াই, আরব প্রতিবেশীদের অবস্থান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি সদ্য গঠিত জাতিসংঘের হাতে সমর্পণ করে। সাধারন পরিষদ নিযুক্ত একটি কমিশন এলাকাটি ঘুরে এসে যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে দুই ধরনের সমাধান ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ভূখন্ডটি ভাগ করে একটি ইহুদি, অপরটি আরব রাষ্ট্র তৈরির সুপারিশ করেন। জেরুজালেমকে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রনে একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদার নগরে পরিনত করাও তাদের সুপারিশে ছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যরা বিভক্তির স্থলে জেরুজালেমকে রাজধানী করে আরব ও ইহুদি অংশ নিয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করেন। সাধারন পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশ গ্রহণ করে ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসে ভূখন্ডটি বিভক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সব আরবদের প্রতিবাদের মুখে ১৫ মে ১৯৪৮ সালে জিয়নবাদীরা তাদের ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়। এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পূর্বে ১৯৪৬ সালে ফিলিস্তিনে মোট জনসংখ্যা ১,৯৭২,৫৬০ জনের মধ্যে ইহুদি ছিল মাত্র ৬,০৮,২৩০। অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠ ইহুদিদের জন্য মোট ২৬,৩২৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৫৬.৪৭ শতাংশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের জন্য ৪২.৮৮ শতাংশ ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিন জাতিকে কিভাবে বৈষম্যের শিকার করেছিল।

ফিলিস্তিনী আরব জনগণ ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণাকে শুরু থেকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা দাবি করে যে তাদের মাতৃভূমিকে এভাবে বিভক্ত করার বিষয়ে জড়িত আইনগত ইস্যুসমূহ পরীক্ষা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ইচ্ছা চাপানোর কর্তৃত্বের বৈধতা বিচার করার জন্য বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠানো হোক। ফিলিস্তিনীদের প্রতিবাদ ও তাদের উপর জিয়নবাদীদের সন্ত্রাসী হামলার কারণে পরবর্তী দিনগুলো গুরুত্ব লাভ করে। পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাওয়ায় সেসময় ফিলিস্তিনকে সাময়িকভাবে জাতিসংঘের অছি ব্যবস্থায় রাখার মার্কিন প্রস্তাবও জিয়নবাদীদের বিরোধিতার কারণে অনুমোদন করা যায়নি।

ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার পরপরই প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো জিয়নবাদীদের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে জিয়নবাদীরা প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রের আরও কিছু এলাকা দখল করে নেয়। তবে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর জর্দান এবং মিশর সীমান্ত সংলগ্ন গাজা মিশরের দখলে চলে যায়। তাদের দখলকৃত এলাকা থেকে ফিলিস্তিনীদের বিতাড়ন করে এলাকাগুলো শূন্য করতে জিয়নবাদী সশস্ত্র বাহিনী খুব ঠান্ডা মাথায় ফিলিস্তিন অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে গণহত্যা চালিয়ে যেতে থাকে। এতে প্রানভয়ে ভীত হাজার হাজার ফিলিস্তিনী প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয় নেয়। এভাবে শুরু হয় তাদের উদ্বাস্তু জীবন যার অবসান আজো হয়নি।

ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল রাষ্ট্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তার ভূমিকা পালন করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ ও ফরাসী উপস্থিতির অবসান হলে যুক্তরাষ্ট্র সে শূণ্য স্থান পূরণে এগিয়ে আসে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে তার ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা না মেলায় আরব জাতি পাশ্চাত্যের প্রতি বিতশ্রদ্ধ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাই এ অঞ্চলে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। ইসরাইল রাষ্ট্রটির ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় এর কৌশলগত গুরুত্ব মার্কিনী রণকৌশলীদের নজর কাড়ে। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে আসন পাতার জন্যও ইসরাইলকে তাদের দরকার হয়।

১৯৪৮ সালের পরে প্রথমদিকের ফিলিস্তিন নেতৃত্ব নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর নির্ভর করতে চেয়েছে। কিন্তু এক পর্যায়ে এসব সাবেকী নেতৃত্বের পাল্টা তরুন প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে উঠে যারা অস্ত্রহাতে লড়াই করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। এদের মধ্যে ছিলেন ইয়াসির অরাফাত, আবু জিয়াদ, জর্জ হাব্বাসের মতো নেতা। তারা ভেবেছিলেন যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ স্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন জাতীয়তাবাদী, কেউ আবার মার্ক্সবাদী। ১৯৬৮ পরবর্তী বছরগুলো ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্তা (PLO) এসব গেরিলা নেতাদের নিয়ন্ত্রনে কাজ করেছে। ফিলিস্তিন সনদকে আগামী দিনের আন্দোলনের রাজনৈতিক

লক্ষ্যের আলোকে রূপান্তর এবং একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামকে তাদের করনীয় বলে এসময় স্থির করা হয়। সনদ অনুযায়ী পরবর্তী কালে প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো ইসরাইলের উপর সশস্ত্র গেরিলা আক্রমন গড়ে তোলে যাকে ইসরাইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রগণ সন্ত্রাসবাদ বলে অঅখ্যায়িত করেছে। গেরিলা যোদ্ধাগণ এসময় ইসরাইলী বিমান ছিনতাইসহ সামরিক ও অসামরিক স্থাপনায় তাদের আক্রমন পরিচালিত করে। তাদের প্রতি আন্তর্জাতিক উদাসিনতার প্রতিবাদ হিসাবে তারা বিমান ছিনতাই করলেও পরে আন্তর্জাতিক সমর্থন সৃষ্টি হলে এ কৌশল পরিত্যাগ করে। তবে ইসরাইল রাষ্ট্রকে অস্বীকার করাসহ সশস্ত্র প্রতিরোধের অন্যান্য দিক অব্যাহত রাখে।

ইসরাইলের প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের তাদের মাটিতে গ্রহণ করলেও গেরিলাদের অবাধে কাজ করতে দেয়নি। এটা বলা যায় যে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে জাতীয় স্বার্থ ও অভ্যন্ত রীণ রাজনেতিক বাধ্যবাধকতা দ্বারা। অথচ আরব রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে ফিলিস্তিন নেতৃত্ব সবসময় এমন পদক্ষেপ আশা করেছে যা তাদেরকে ইসরাইলকে মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে। কিন্তু আরব নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থ থেকে ফিলিস্তিনী স্বার্থ আলাদা করে দেখার ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আরব ভূমিকে ইসরাইল বিরোধী হামলার জন্য ব্যবহার করতে দিতে এসব নেতাদের দুটো কারণে আপত্তি ছিল। এক, ইসরাইলের উপর আক্রমন হলে ইসরাইল পাল্টা প্রতিশোধমূলক হামলা করবে বলে তাদের ধারনা ছিল। বাস্তবেও তাই হয়েছে। দুই, গেরিলাদের সশস্ত্র কার্যকলাপের ফলে কোন কোন আরবরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকার-বিরোধী জঙ্গি রাজনৈতিক পক্ষ শক্তিশালী হচ্ছিল। যেমন, লেবাননে সত্তর দশকের মাঝামাঝি শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধে ডানপন্থীদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সাহায্য করছিল ফিলিস্তিন গেরিলারা। সত্তর দশকের শুরুতে জর্দানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বিবেচনা করে জর্দানী সেনাবাহিনী পিএলওর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সামরিক হামলা শুরু করে যার কারণে পিএলওকে জর্দানের ঘাঁটি ছেড়ে লেবাননে চলে আসতে হয়। অন্যদিকে এসব রাষ্ট্রের নেতারা ইসরাইলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নির্দ্ধারণে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তা গেরিলারা তীক্ষ্ন সমালোচনা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করছিল।

ফিলিস্তিনীরা পিএলওর নেতৃত্বে তাদের স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে গেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গেরিলাগোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে আদর্শগত ও রণকৌশলগত পার্থক্য সত্বেও অধিকার অর্জনের ব্যাপারে সবাই সশস্ত্র লড়াইতে বিশ্বাসী ছিল। ইসরাইল কোন সময়ই ফিলিস্তিনী জনগণকে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের কোন পক্ষ হিসাবে স্বীকার করেনি। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র তাকে নৈতিক ও প্রচারমূলক সমর্থন যুগিয়েছে। উভয় পক্ষ গেরিলাদের সন্ত্রাসবাদী আখ্যায়িত করে তাদের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছে। ইয়াসির আরাফাত একই সাথে লড়াই ও কূটনৈতিক আলোচনার উপর গুরুত্বারোপ করে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত তার প্রথম ভাষণে সশস্ত্র সংগ্রাম যে তাদের অধিকার আদায়ে চাপ সৃষ্টির একটি কৌশল ছিল তা তুলে ধরেন। কিন্তু সত্তর দশকের শেষদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোকে পাশ কাটিয়ে মিশর যখন ইসরাইলের সঙ্গে সমঝোতা প্রক্রিয়া চালু করে এবং ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে ফিলিস্তিনীদের জন্য জর্দানের নিয়ন্ত্রনে পাঁচ বছর মেয়াদী স্বায়ত্বশাসনে রাজী হয় ফিলিস্তিনীরা তা প্রথাখ্যান করে। কারণ এ জাতীয় সমাধান তাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ফিলিস্তিনীদের জাতীয় সত্বাকে ক্যাম্প ডেভিড সমাধানে অবজ্ঞা করা হয়েছিল।

ভূমির বিনিময়ে শান্তি, ওয়াশিংটন চুক্তি, ফিলিস্তিন স্বশাসন

১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে মাদ্রিদে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে আহুত এক শান্তি সম্মেলনে ফিলিস্তিনীরা প্রথমবারের মতো জর্দান প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসরাইলের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসে। এর আগে কখনই তারা ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে চায়নি। নব্বই দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক সিস্টেমে যে পরিবর্তনের হয় তাতে বিশ্ব জুড়ে মার্কিন আধিপত্য আরও উগ্র হওয়ার সুযোগ পায়। এবং উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকের অভাবে ফিলিস্তিনীদের দর কাষাকষির সুযোগও সীমিত হয়ে যায়। তাই তাদের আলোচনার টেবিলে বসা ছাড়া কোন বিকল্প তখন ছিল বলে মনে হয়না।

ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনী নেতারা তাদের সংগ্রামে কৌশলগত কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন। ১৯৮৭ সালে অধিকৃত এলাকায় অধিবাসীরা গণঅভুত্থান তথা ইন্তিফাদা নামে পরিচিত এক নিরস্ত্র প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রস্তরখন্ড হাতে তারা ইসরাইলী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ভাবে তা ব্যাপক সাড়া তোলে। উত্তরোত্তর ইন্তিফাদা শক্তি অর্জন করলে পিএলও নেতারা ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিনীদের প্রবাসী পার্লামেন্ট, জাতীয় কাউন্সিলে তাদের প্রবাসী সরকার ঘোষণা করে। পাশাপাশি তারা ইসরাইলকে স্বীকার করে নেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ায় পিএলও নেতৃত্ব তাদের পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। মাদ্রিদ আলোচনা প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে সে পরিবর্তন ধারা পিএলও অব্যাহত রাখে। এসময় থেকে ইসরাইল 'ভূমির বিনিময়ে শান্তি' ধারনা ফিলিস্তিনীদের নিকট তুলে ধরে। এ কাঠামোর ভিতর বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে শান্তি সম্মেলনের দশটি অধিবেশন হলেও দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হচ্ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপটেম্বর দু'পক্ষ ওয়াশিংটনে বসে এক চুক্তি করে যাকে Declaration of Principles (DOP) বলে উলে-খ করা হয়। আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরের আগে তিন মাস ধরে নরওয়েতে দু'পক্ষের মধ্যে গোপন আলোচনা করে এর পথ প্রসস্ত করা হয়েছিল। নরওয়ের উদ্যোগে গৃহীত অসলো প্রক্রিয়ায় সফলতা আসে যখন দু'পক্ষ একে অপরকে স্বীকার করে নিয়ে ওয়াশিংটনে চুক্তি স্বাক্ষর করে যাতে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ফিলিস্তিনী স্বশাসন কর্তৃপক্ষ গঠন সহ গাজা ও পশ্চিম তীরের অধিকৃত শহর থেকে ইসরাইলী সেনা প্রত্যাহার, ফিলিস্তিন আইন সভার নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতা সম্ভব হয়। ইসরাইলী প্রত্যাহার শুরু হয় গাজা ও পশ্চিম তীরের ক্ষুদ্র শহর জেরিকো থেকে।

তবে ওয়াশিংটন চুক্তি স্বাক্ষরের সময় নতুন সম্পর্কের ব্যাপারে যে আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল সে পরিমানে সফলতা পরের মাস গুলোতে লক্ষ্য করা যায়নি। এর কারণ ইসরাইল কর্তৃক চুক্তির বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা ও সে ব্যাপারে ফিলিস্তিনীদের সঙ্গে তাদের মত পার্থক্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইসরাইলের চুক্তি বিরোধী ডানপন্থীদের সহিংস কার্যকলাপ যাতে এক পর্যায়ে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী রাবিন নিহত হন। ইসরাইলী ডানপন্থীদের সহিংসতার জবাবে ফিলিস্তিনী জঙ্গিরাও সহিংসতা প্রদর্শন করে। এতে করে চুক্তি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ পিছিয়ে যায়। মার্কিন হস্তক্ষেপে আরো কিছু সহায়ক চুক্তি করা হয় দু'পক্ষের ভিতর মূল চুক্তিকে বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু ফিলিস্তিন জনগণ দীর্ঘ দিন পরেও তাদের সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপায়িত হতে না দেখে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এরকম এক সময় ২০০০ সালে সেপটেম্বরে এারিয়েল শ্যারন আল আকসা মসজিদ সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে ফিলিস্তিনী জন-অনুভূতিকে উসকে দেন। এ থেকে দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পথ প্রসস্ত হয় যা গত কয়েক মাসে ফিলিস্তিনী তরুন-যুবাদের আত্মঘাতী মানব বোমার ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসরাইলে গত বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে শ্যারন জয়ী হওয়াতে তার নেতৃত্বে এক চরম ডানপন্থী কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে পরিস্থিতি আরো সঙ্কটাপন্ন হয়ে যায়। ❑

লেখক পরিচিতিঃ ডঃ আকমল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক। (এ লেখাটি ফিলিস্তিনী সংহতি জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ২৭ জুন ২০০২ টিএসসিতে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ।)

ইয়াসির আরাফাত ও প্যালেস্টাইন: রাজনীতি ও প্রাসঙ্গিকতা

ফুয়াদ রাহমান

প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন বা পিএলও'র চেয়ারম্যান এবং প্যালেস্টাইনিয়ান অথরিটির (পিএ) প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত পৃথিবীর অন্যতম পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ফিলিস্তিনি জাতির স্বাধীকার আন্দোলনের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই মানুষটির নাম। অন্যদিকে ইসরাইলের কাছে তিনি একজন ঘৃণিত ব্যক্তিত্ব, যার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মতবাদকে স্রেফ সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা করতেও তারা পিছপা হন না। বিতর্ক ও কিংবদন্তীর এই মানুষটিকে একটু কাছ থেকে দেখার প্রচেষ্টায় এই লিখা।

মোহাম্মদ ইয়াসির আবদুল রাউফ কাদওয়া আল হুসেইনী, সংক্ষেপে ইয়াসির আরাফাতের জন্ম ২৪ আগস্ট ১৯২৯। তার জন্মস্থান ও জন্ম তারিখ নিয়ে মতবিরোধ আছে। আরাফাত নিজের জন্ম জেরুজালেমে বলেন, কিন্তু কায়রোতে তার জন্মের সার্টিফিকেট আবিষ্কার করেছেন অন্যান্যরা। অনেকের মতে তার জন্ম ৪ আগস্ট ১৯২৯। তার ছোটকাল নিয়েও রয়েছে অনেক বিতর্ক। অনেকের মতে, তিনি জন্মেছেন এবং তার ছোটবেলা কাটিয়েছেন গাজায়। তিনি সাত ভাই বোনের একজন বলে জানা যায়। ১৯৪৭ সালের প্রথম যুদ্ধে তিনি জেরুজালেমের প্রধান মুফতীর পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং পরের বছর প্যালেস্টাইন ছেড়ে মিসরের কায়রোতে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন (১৯৫২-১৯৫৬) এবং একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন অব প্যালেস্টাইনিয়ান স্টুডেন্টস-এ যোগদান করেন। এক সময় তিনি এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৬ সালে মিসরীয় সেনাবাহিনীর সাথে সুয়েজের যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সেই বছরই তিনি কুয়েতে বসবাস শুরু করেন এবং নিজের কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি আল ফাতাহ দলের গোড়াপত্তন করেন।

এর পরের ইতিহাসও বিতর্কিত। ১৯৬৭ সালে আল ফাতাহ পিএলও-তে যোগ দেয় এবং অনেকের মতে ১৯৬৭-৬৮ সালে আরাফাত জর্ডান, প্যালেস্টাইন, ইসরায়েল ও জেরুজালেমের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করেন। এ সময়ে তার রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থান বিতর্কিত। ফিলিস্তিনিদের কাছে তিনি মুক্তিযোদ্ধা এবং ইসরাইলীদের কাছে সন্ত্রাসী হিসেবে তিনি হয়ে উঠেন পরিচিত। তবে ১৯৬৮ সালে আল-কারামাহ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন বলে প্রমাণ আছে। ১৯৬৮ সালে তিনি পিএলও'র চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সময় আরাফাত জর্ডানে ছিলেন। ১৯৬৯ সালে জর্ডানে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পর তিনি লেবাননে চলে যান। তিনি পিএলও'র ইতিহাসের তৃতীয় চেয়ারম্যান। তিনি এখনও এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই সময় পর্যন্ত আরাফাতের নেতৃত্বে পিএলও ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে এই এলাকায় স্বাধীণ ও স্বার্বভৌম প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকার বদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালে এই আরাফাতই প্যালেস্টাইন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে পিএলওকে নিয়ে যান। পিএলও জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম নন-গভর্নমেন্ট দল/দেশ হিসেবে এর সভায় যোগদান করে এবং আরাফাত তার বিখ্যাত বক্তৃতা দেন: "আমি একহাতে বন্দুক আর আরেক হাতে জলপাই শাখা নিয়ে এসেছি, আমার হাত থেকে জলপাই শাখাটিকে তোমরা কেড়ে নিও না"। কিন্তু সমস্যা মেটে না। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল তিন মাস বৈরুত অবরোধ করে রাখে এবং লিবাননের সমূহ ক্ষতিসাধন করে। এরপর তিনি তিউনিসিয়ায় চলে যান। ১৯৮৯ সালে আবার তাকে দেশ পরিবর্তন করতে হয় এবং তিনি ইরাকের বাগদাদে চলে যান। ১৯৮৮ সালের ১৫ই নভেম্বর আলজিরিয়ায় অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি প্যালেস্টাইন দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং ১৯৮৯ সালে তাকে স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। শান্তি প্রক্রিয়ার ধারায় ১৯৯৩ সালে আরাফাত ইসরাইলের 'রাইট টু একজিষ্ট' বা ইসরাইলের টিকে থাকার অধিকারে সম্মত হন। ১৯৯৩ সালের ওসলোতে পাঁচ বছর মেয়াদী শান্তি চুক্তিতে তিনি পিএলওর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন। অসলো শান্তি চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরদাতা হিসেবে ১৯৯৪ সালে তিনি নবেল শান্তি পদক পান। তার সাথে এই পদক ভাগ করেন ইসরাইলের রাবিন ও পেরেস। ১৯৯৪ থেকে আরাফাতের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের স্বায়ত্বশাসন শুরু হয় এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি প্যালেস্টাইন অথরিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি এখনও এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

এই ছোট বর্ণনা লিখতে যেয়ে মনে হলো আজ ২০০২ সালের শেষ প্রান্তে। তাহলে স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশটি পৃথিবীতে নেই কেন? ২০০২ সালের শেষপ্রান্তে এসে স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। কি এমন কান্ড ঘটালেন ইরাসির আরাফাত ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সালের ভিতর যাতে নবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী একজন নেতা আজ সন্ত্রাসীদের নায়ক বলে প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক অভিযুক্ত? এর কারণ সন্ধানে আমাদের যেতে হবে প্যালেস্টাইনের বর্তমান অবস্থার একটা বাস্তব ও সঠিক মূল্যায়নের কাছে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের ট্রেড এন্ড ডেভেলপমেন্ট গোষ্ঠীর তৈরি করা রিপোর্ট অনুযায়ী প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার ৭০% জাতিসংঘের দারিদ্রসীমার (দিনে ২ ডলারের কম) নিচে বাস করছে। ২০০১-০২ সালে শুধুমাত্র ওয়েস্ট ব্যাংক ও গাজা এলাকার অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে ২.৪ বিলিয়ন ডলার। এই দারিদ্রের মূল কারণ হিসেবে বলা হয়েছে জনগনের স্বাধীনভাবে চলাচলের অক্ষমতা, গণবেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর সিংহভাগের ইসরায়েলের ট্যাংক ও হেলিকপ্টারের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্তি। এই রিপোর্ট অনুযায়ী 'প্যালেস্টাইনের অর্থনীতি ঠিক করা সম্ভব নয়'। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ৫ বছরের ছোট ফিলিস্তিনি শিশুদের ভিতর অপুষ্টতার হার মধ্য আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশগুলোর চাইতেও খারাপ। ৩০% শিশু দৈনিক খাবারের জন্য সরাসরি কোন না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পাশাপাশি ইসরায়েলের শিশুদের পুষ্টতার হার যে কোন পশ্চিমা প্রথম বিশ্বের দেশের তুলনীয়।

সমস্যাটা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গে-াবাল এক্সচেঞ্জ ১৮ সদস্যের একটি দলকে এই বছরের শুরুতে পাঠিয়েছিল প্যালেস্টাইন, ওয়েস্ট ব্যাংক ও গাজা পরিদর্শনে। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে চলাচল, মাল পরিবহন ও অন্যান্য যে কোন রকমের যাত্রা প্রায় অসম্ভব। কেননা ওয়েস্ট ব্যাংকের ৫২% এবং গাজার ৩০% দখল করে ইসরায়েলী সেনাবাহিনী তৈরি করেছে এক মাকড়শার জাল। এই জালের অংশ হিসবে আছে অসংখ্য চেক পয়েন্ট, জুড়িশডিকশন এলাকা, বাইপাস রাস্তা ও পারমিট ভিত্তিক চলাচলের লাল সুতা। এর ফলে পণ্যের পরিবহন হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অর্থনীতি পড়েছে মুখ থুবড়ে। বর্তমান প্যালেস্টাইনে অসলো শান্তি চুক্তির পূর্বের তুলনায় গড়ে আয় কমে হয়েছে আট ভাগের এক ভাগ। আরো মজার কথা হচ্ছে যে পানিসহ অন্যান্য সব প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে ইসরায়েলের অধীনে, যার ফলশ্রুতিতে অর্থনীতি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে স্থবির। অন্য দিকে রয়েছে ক্রমবর্ধমান ইসরাইয়েলী সেটেলমেন্টস। সোজা অর্থে অধিকৃত প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য পাড়া বা

ছোট শহর। কিন্তু এই সেটেলমেন্টগুলো অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেনি। যেমন ওয়েস্ট ব্যাংকের উত্তরে যে সেটেলমেন্ট করা হয়েছে তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে প্রাকৃতিক পানির উৎস। মধ্যবর্তী অন্য একটি সেটেলমেন্ট, যা গড়ে উঠছে গিভাটজিভ ও মালেই আদুমিনের মধ্যে, তা ওয়েস্ট ব্যাংককে দু' ভাগে বিভক্ত করেছে। কাজেই ফিলিস্তিনিরা যখন দক্ষিণ থেকে উত্তরে যান বা উত্তর থেকে দক্ষিণে আসেন তখন তাদের আসতে হয় ইসরায়েলের চেক পয়েন্ট পার হয়ে। তাছাড়া এই চেকপয়েন্ট জেরুজালেম ভিত্তিক ২০০,০০০ ফিলিস্তিনিকে ও সাথে সাথে ফিলিস্তিনি অর্থনীতির ৪০%কে করে দিয়েছে বিভক্ত। তৃতীয় একটি সেটেলমেন্ট এফতাইগুশ থেকে ইলিট পর্যন্ত জেরুজালেমের দক্ষিণ পশ্চিমে গড়ে উঠেছে যার সাথে ফিলিস্তিনিরা হারিয়েছে দক্ষিণে তাদের পানির উৎস। এর ফলশ্রুতিতে স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশের অস্তিত্ব অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত কোন ইসরাইয়েলী সরকারের আমলে সেটেলমেন্ট তৈরি বন্ধ হয়নি - কাজেই এই অধিকৃত জমি তাদের কোন দিনই ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। আরও মজার কথা হচ্ছে যে এই সব নতুন সেটেলমেন্টে বাসকারীদের অবশ্যই ইহুদী হতে হয় - যা বর্ণবাদী আইনের এবং জেনেভা কনভেনশনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ফিরে যাই আবার ১৯৯৪ তে। ইয়াসির আরাফাত গাজায় ফিরে আসেন সবার কাছে ভবিষ্যত শান্তির একজন প্রধান নায়ক হিসেবে। ১৯৯৫ সালে মিশরের তা'বায় ওসলো-২ নামের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে একজন ইসরায়েলী সন্ত্রাসীর হাতে নিহত হন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রাবিন। শান্তিচুক্তির অন্যতম স্থপতি সিমন পেরেস ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হন। সমস্যা শুরু হয় এখন থেকে। পাঁচ বছরের শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সৈন্য অপসারনে গড়িমসি ও উভয় পক্ষের চরমপন্থীদের পারস্পরিক আক্রমণে স্থবির হয়ে পড়ে শান্তি প্রক্রিয়া। পেরেস পরের নির্বাচনে হেরে যান নেতানেহানুর কাছে। কিন্তু শান্তি প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ অচল হয়নি। ১৯৯৮ সালে ওয়াই রিভার চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ চরমপন্থীদের জন্য ইসরায়েলী সরকার অচল হয়ে পড়ে এবং ইয়াহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রীত্ব পান। ২০০০ সালের মে মাসে ক্যাম্প ডেভিডে বারাক, ক্লিন্টন ও আরাফাত আবারও আলোচনায় বসেন। বারাকের দেয়া প্রস্তাবে আরাফাত অসম্মতি জানান। এই সময়টি আরাফাতের রাজনৈতিক জীবনের এক সমস্যা সংকুল সময় - কেননা তিনি সরাসরি এক রাজনৈতিক ফাঁদে পা দেন। কাগজে কলমে ৯১% প্যালেস্টাইন ভূমি ও পূর্ব জেরুজালেম তাকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দেয়া হয়, কিন্তু সেই প্রস্তাবের ৯% জমি প্রস্তাবিত প্যালেস্টাইন দেশটিকে অর্থনৈতিক ভাবে অবাস্তব করে দিত। তাছাড়া ভাল ভূমি ও অধিকাংশ প্রাকৃতিক পানির উৎস তাকে ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা বা অনভিজ্ঞতার কারণে এই চুক্তির ব্যর্থতাকে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে ২০০১ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের হস্তক্ষেপে ৯৭% গাজা ও ১০০% ওয়েস্ট ব্যাংকসহ একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন দেশের প্রস্থান দেয়া হয় আরাফাতকে। আরাফাতের রাজনৈতিক জীবনের বিরাট ভুল এখানেই। এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে তিনি আরও ভাল প্রস্তাবের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের মঞ্চে আগমনের পর তার সমস্ত হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। আরাফাতের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা অবশ্যই এই চুক্তির ব্যর্থতার একটি কারণ, কিন্তু শ্যারনের আগমন তার চাইতেই বড় কারণ। শ্যারন কখনোই শান্তি চুক্তিকে গ্রহণ করেননি - ১৯৮২'র নৃসংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক এই সাবেক জেনারেল সব সময়েই প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি কখনই কোন লুকাছাপা করেননি। অন্যতম আরেকটি কারণ হলো প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের বিদায় ও প্রেসিডেন্ট বুশের আগমন। প্রেসিডেন্ট বুশ তার ক্ষমতা গ্রহণের পরবর্তী এক বছর মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশাল সমস্যার সমাধানে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাননি - যার ফলে শ্যারনের পক্ষে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিস্থিতি পরিবর্তনে কোন বেগ পেতে হয়নি।

এখন প্রশ্ন হলো ইয়াসির আরাফাত পরিস্থিতি এতো দূরে গড়াতে দিলেন কেন? এখন তাহলে দৃষ্টি ফেরাতে হয় 'প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল অথরিটি' নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি। অন্তত পশ্চিমা দেশগুলার কথা অনুযায়ী রাজনৈতিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি এর ছোট শাসন আমলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ হিসেবে রয়েছে দুর্নীতি, পুলিশ নির্যাতন, রাজনৈতিক নিষ্পেশন, ইসরায়েলের হস্তক্ষেপ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের স্থবিরতা। ১২০টির মত মন্ত্রণালয় সরাসরি ইয়াসির আরাফাতের কাছে জবাবদিহি করে বলে জনশ্রুতি আছে। ১৯৯৭ সালের প্যালেস্টাইন সংসদের এক রিপোর্টে জানা যায় যে প্যালেস্টাইন অথরিটির ৮০০ মিলিয়ন ডলারের বার্ষিক বাজেটের ৪০% বিভিন্ন কারণে নষ্ট করা হয়। সাম্প্রতিক ইসরায়েলী আক্রমণের আগে (২০০০ সালের আগে) ৪০,০০০ জনের এক বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল ইয়াসির আরাফাতের সরাসরি অধীনে। কিন্তু তারই সাথে সাথে বিচার বিভাগ ও আইন মন্ত্রণালয় ৯০ দশকের শেষের ৫ বছর কোনভাবে কার্যকর ছিল বলে মনে হয় না। যদিও ইসরায়েল প্রতি পদে আরাফাতকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, প্যালেস্টাইন অথরিটির অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটাতে আরাফাতের অনীহা ও অপারগতা এই ব্যার্থতাকে অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছে।

বর্তমানে ফিরে আসি। ইন্তিফাদার পরবর্তী ইসরায়েলী আক্রমণে প্রশাসনিক, আমলাতান্ত্রিক ও প্রতিরক্ষা আবকাঠামোর সম্পূর্ণ ধ্বংসের পর ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইন অথরিটির কতটুকু ক্ষমতাতে অধিষ্ঠিত আছেন তা বিতর্কের বিষয়। আত্মঘাতী বোমা হামলায় ইসরায়েলী অসামরিক জীবননাশের ব্যাপারে ইয়াসির আরাফাত কতটুকু করেছেন, বা তিনি আদৌ কিছু করতে চান কিনা তা নিয়েও বিতর্ক আছে। প্রশ্ন হচ্ছে তার পক্ষে রামাল-য় তার ধ্বংসপ্রাপ্ত হেড কোয়ার্টারে অবরুদ্ধ থেকে কতটুকু করা সম্ভব? প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রধানমন্ত্রী শ্যারন তাকে বার বার বলেছেন, আত্মঘাতী বোমা আক্রমণ বন্ধে পদক্ষেপ নিতে, কিন্তু এই পদক্ষেপের জন্য যে জিনিসগুলো সবচাইতে জরুরী, যেমন একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, পুলিশ বাহিনী ও অন্যান্য অবকাঠামো, তা প্রতিনিয়ত এসেছে ইসরায়েলের আক্রমণের মুখে। সমস্যা আরও খারাপ হয়েছে প্রেসিডেন্ট বুশের একতরফা অবস্থান গ্রহণে। এমনকি ইসরায়েলী পত্রপত্রিকাতে তার রাজনৈতিক অবস্থানকে লিকুদ পার্টির অবস্থানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের সুরে মুখ মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট বুশ আরাফাতকে সম্প্রতি 'অপ্রাসঙ্গিক' ঘোষণা করেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বানের সাথে বাস্তবতার কতটুকু সম্পর্ক আছে তা বিতর্কের বিষয়। সম্প্রতি জেরুজালেম মিডিয়া ও কমিউনিকেশন সেন্টারের এক জরিপে দেখা গেছে ফিলিস্তিনিরা ইয়াসির আরাফাতকেই সবচেয়ে বিশ্বস্ত নেতা হিসেবে গণ্য করেন। মুক্ত ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যে আরাফাতই আবার নির্বাচিত হবেন এই ব্যাপারে তেমন কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট বুশের অন্য একটি ধারণা সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। তার মতে, স্বাধীন নির্বাচনে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলীদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলার বিরুদ্ধে রায় দিবে। কিন্তু আল হারাত আল জাদিদাহ পত্রিকাটির এক জরিপে দেখা গেছে যে, ৬০% ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা সমর্থন করেন এবং ৮৬% ইসরায়েলী সৈন্যবাহিনী ও সেটলাারদের বিরুদ্ধে হামলা সমর্থনা করেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন নিয়েও উত্তরের চাইতে প্রশ্নই আছে বেশি। এ বছরের ১২ সেপ্টেম্বর আরাফাতের মন্ত্রিসভা গণপদত্যাগ করেন কেননা তাদের বিরুদ্ধে 'নো কনফিডেন্স' ভোটের বিজয় প্রায় নিশ্চিত ছিল। প্রেসিডেন্ট আরাফাত ২০শে জানুয়ারি, ২০০৩ সালে প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞের মতে, প্যালেস্টাইনে অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব। বিবিসির জেরুজালেম করেসপন্ডেন্ট পিটার বাইলস বলেন, "যেখানে জনগণের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার নেই, যে দেশে বেশির ভাগ স্থান সরাসরি সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন, সেখানে কিভাবে ৪ মাসের মধ্যে অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব তা বোধগম্য নয়"। বর্তমানে যেহেতু ৮টির মধ্যে ৭টি ফিলিস্তিনি

শহর ইসরায়েলী সেনাবাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ এবং কম করে হলেও অর্ধেক জনগণ কারফিউ এর ভিতর দিন যাপন করছেন - তাতে বাইলসের মন্তব্য বাস্তবিক বলেই মনে হয়। প্রেসিডেন্ট বুশের আহ্বান উপেক্ষা করে ইয়াসির আরাফাত এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা বলেছেন এবং এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র আবু সিতার নামের একজন নেতা তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। হাতে গোনা কিছু ভোটের বেশি আবু সিতার পাবেন বলে কেউ মনে করেন না। এই নির্বাচন সম্পর্কে লসএঞ্জেলস টাইমস ওয়াশিংটন-ভিত্তিক ফাউন্ডেশন ফর মিডলইস্ট পিসের ডিরেক্টর জেফরী অ্যারনসনকে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছে, 'যুদ্ধের ভেতর অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব।'

প্রশ্ন হচ্ছে অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন যদি সত্যিই অনুষ্ঠিত হয় এবং যদি ইয়াসির আরাফাত আবারও নির্বাচিত হন, তাহলে প্রেসিডেন্ট বুশ ও প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের সামনে কোন পথ খোলা থাকবে? এই সম্ভাব্যতার আলোকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাঁধা দেয়ার এবং তাকে আগেই সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। শ্যারনের একজন প্রধান উপদেষ্টা আরাফাতের নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা শুনে বলেছেন, 'যতদিন আরাফাত প্রেসিডেন্ট থাকবেন ততদিন কোন সমস্যার সমাধান হবে না'। এই উপদেষ্টা, রানান গিসিন, আরো বলেছেন যে, 'শান্তি ও পরিবর্তন শুরু তখনই আসবে যখন আরাফাত এখানে থাকবে না।' সমস্যা হচ্ছে আরাফাতকে যদি তাদের পছন্দ নয়, তবে কাকে তাদের পছন্দ? আরাফাতের সম্ভাব্য বদলী হিসেবে নাম এসেছে কিছু নেতার। যেমন ফাতাহর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ফারুক কাদুমী ও ওসলো শান্তি চুক্তির একজন স্থপতি মাহমুদ আব্বাস। ফারুক কাদুমী ওসলো শান্তি চুক্তির বিপক্ষে ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে এবং আব্বাসের তেমন তৃণমূল রাজনৈতিক ভিত্তি নেই বলে অনেকেরই সন্দেহ করেন। মারওয়ান বারগুতীর নামও এসেছে সম্ভাব্য নেতা হিসেবে। তিনি তরুণ ও ইসরায়েল বিরোধী ইন্তিফাদার একজন নায়ক এবং বর্তমানে ইসরায়েলী জেলে। যদিও তিনি আরাফাতের প্যালেস্টাইনী অথরিটির দুর্নীতি ও স্থবিরতা নিয়ে প্রচুর কথা বলেছেন, কিন্তু অনেকের মতে তিনি আরাফাতের চাইতে অনেক বেশী উগ্রপন্থী হবেন। আরাফাতকে যদি জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে নেতৃত্বের শূন্যতায় এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলে উগ্রপন্থী হামাস বা ইসলামিক জিহাদ আরো ক্ষমতাশালী হবে - ফলশ্রুতিতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি হবে আরো অনিশ্চিত। এই সমস্যার কথা অনুধাবন করেই সম্ভবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন ছয় মাস পিছিয়ে দেবার জন্য নতুন করে প্রস্তাব করেছে।

ইয়াসির আরাফাতের রাজনৈতিক জীবনের মূল্যায়ন করা খুব কঠিন। তিনি নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীকার অর্জনে অনেক সফলতা পেয়েছেন। একসময় 'প্যালেস্টাইন' ও 'সন্ত্রাস' শব্দ দুটি সমার্থে ব্যাবহৃত হতো। কিন্তু তা আর এখন সত্যি নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও মূলতঃ ইসরায়েলপন্থী থাকলেও ইউরোপসহ পৃথিবীর অন্যান্য বেশীর ভাগ দেশ কিন্তু এখন ফিলিস্তিনিদের স্বাধীকার প্রশ্নে একমত। এর সবচাইতে বড় প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি জেনিন আক্রমনের ঘটনায়। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম গুলো ছাড়া ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের ও পৃথিবীর অন্য সব দেশের প্রচার মাধ্যম গুলো এই ঘটনার নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে ক্রমশঃ হয়ে পড়ছে বন্ধুহীন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই পটপরিবর্তনে ইয়াসির আরাফাতের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে ইয়াসির আরাফাতের অনেক গলদও পাওয়া যাবে। তার হয়তো উচিৎ ছিল প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের দেয়া ক্যাম্প ডেভিড প্রস্তাব গ্রহণ করা। তার হয়তো উচিত ছিল ইরাক যুদ্ধের সময় ইরাককে সমর্থন না করে কুয়েতকে সমর্থন করা। তার হয়তো বা উচিৎ ছিল আত্মঘাতী বোমা হামলা বন্ধ করা। তার হয়তো উচিৎ ছিল হামাসসহ তার দলের উগ্রপন্থীদের আরও দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। তার হয়তো উচিৎ ছিল প্রকৃত গণতন্ত্র প্যালেস্টাইনে সৃষ্টি করা এবং আরও অনেক কিছু। তার ব্যার্থতার এই পরিসংখ্যানটিকে আরো বড় করা যেতে খুব একটা অসুবিধার কাজ নয়।

কিন্তু এর সবই যুক্তির কথা। যে মানুষটি একটির পর একটি দেশ থেকে দেশে বিতাড়িত হয়েছেন, নিজের চোখে দেখেছেন তার জন্মভূমিকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে, তার দেশবাসীকে অচিন্তনীয় দুঃখ, দুর্দশা ও অপমান সহ্য করতে, তাদের সন্তানদের না খেয়ে থাকতে এবং যিনি এমন একটি জাতির নেতা যারা গত ৫০ বছরে সবারই কাছ থেকে শুধু শান্তির বাণীই শুনেছে কিন্তু তাদের বিপদে কাউকে এক পাও এগুতে দেখেনি, তার সব সিদ্ধান্তকে ঐ পরিস্থিতির বাইরে থেকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে কি মূল্যায়ন করা যায়? ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী ও তার দলের অন্যান্য নেতারা যেমন ভাবে আরাফাতকে সরিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত এবং যেহেতু একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলা যায় যে, ফিলিস্তিনিদের মঙ্গলার্থে তারা ইয়াসির আরাফাতকে সরাতে চাইছেন না, তা দেখে মনে হয় আরাফাতকেই তারা তাদের পথে সবচাইতে বড় বাঁধা হিসেবে গণ্য করেন। ফিলিস্তিনি জনগন আরাফাতের জীবনের সংগ্রাম, ব্যর্থতা ও অসহায়ত্বের ভিতরে দেখতে পান তাদের নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। আরাফাতের সব চাইতে বড় শক্তি এখানেই। আরাফাত হতে পারেন বৃদ্ধ, সম্ভবত পারকিনসনে আক্রান্ত অদূরদর্শী একজন রাজনৈতিক নেতা, দুর্বল প্রশাসক এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের দায়ে দোষী। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীকার আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং প্যালেস্টাইন সমস্যার বর্তমান ও ভবিষ্যত যে কোন সমাধানে তার সংশ্রব শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, খুবই 'প্রাসঙ্গিক'। ❑

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া

ইসরাইলী দখলে প্যালেস্টাইনী জীবন

জিয়ারত হোসেন

সূচনা

১৯৮৬ সালে ম্যানিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনথ্রোপলজি প্রফেসর Dr. Lewis Swift-র দেয়া প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সংঘাতের উপর সেমিনার শুনছিলাম। প্রফেসর Swift-তাঁর ফিল্ডওয়ার্ক ভিডিও'র একটা অংশ দেখাচ্ছিলেন। ভিডিও তে মধ্যবয়স্ক এক প্যালেস্টাইনী কৃষক। পড়নে মলিন পোষাক। নিরাশা ও ক্লান্তির ভারে সে যেন তাঁর নিজের দেহটা নিজেই বইতে পারছেন না। চোখের নীচে কান্নার জল লেগে আছে। গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এক সময় তাঁর অনেক আবাদী জমি ছিল, পাথরে কাজ করা বিরাট বাড়ী ছিলো। বর্তমানে তাঁর সম্পত্তির নতুন মালিক হয়েছে ইউরোপ (বিশেষ করে রাশিয়া) থেকে মাইগ্রেট করা ইহুদী জনগোষ্ঠী। পুরো পরিবার নিয়ে সে এখন গৃহহীন, ভূমিহীন, কর্মহীন, কপর্দকহীন এবং আশাহীন। ইসরাইলী জবর দখলে তাঁর নিজের মাতৃভূমীতে তাঁর নিজের কোন স্থান নেই, পরিচয় নেই। এ চিত্রয়ণ ইসরাইলী অধীনে লাখ লাখ প্যালেস্টইনীর জীবন যাপনকে তুলে ধরে।

১৯৪৮ সালে ইহুদী জনগোষ্ঠী কর্তৃক দাবীকৃত স্বাধীন ইসরাইল প্রায় ৮০% প্যালেস্টাইনী এলাকা দখল করে নেয়। এ সময় এখানে ইহুদী ও প্যালেস্টাইনী জনগোষ্ঠীগুলো যথাক্রমে ৭ লাখ ও ১৩ লাখ। গত ৫৪ বছর ধরে এই ১৩ লাখ প্যালেস্টাইনী এবং তাঁদের উত্তরসূরীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা এক

অসহনীয় ও ভবিষ্যতহীন ধ্বংসস্তুপের উপর পড়ে আছে।

প্যালেস্টাইনী-ইসরাইলী সংঘাত

মানবসভ্যতার ধর্মীয় ইতিহাসে ‘Land of the Philistines’ এবং ‘Biblical Israelities’ অতি পরিচিত ঘটনা প্রবাহ। প্রাচীন কাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্যালেস্টাইন শুধু একটা এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। আধুনিক রাষ্ট্রের মতো এ এলাকার সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক সীমারেখা ছিলো না। গ্রীক ও রোমানরা এই এলাকার নাম দিয়েছিল ‘Land of the Philistines’। তবে বিশেষ করে অর্থোডক্স ইহুদীদের বিশ্বাস যে এ এলাকা হলো ঈশ্বরের ‘promised land’ যেখানে শুধু ইহুদীরাই বাস করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৩-১৯) বৃটেন অটোম্যানদের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন এলাকা দখল করে নেয়। ১৯১৭ সালে বৃটেনের পররাষ্ট্র সচিব (Arthur Balfour) প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইসরাইল অংশে ভাগ করার ঘোষণা দেন। ইউরোপে সমস্যা সম্মুখীন ইহুদীদের পূর্ণবাসন করা হয় ইসরাইলের অংশে। ফ্রান্স ও বৃটেনের সক্রিয় চেষ্টায় ১৯২০ সালে স্থাপিত হয় ইসরাইল। ভূমি হারিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আরবরা ইসরাইলের অস্তিত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। কালক্রমে ইতিহাস ও সংবাদ মাধ্যমে স্থান করে নেয় ১৯৪৭-৪৮ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক প্যালেস্টাইন পার্টিশন, ১৯৪৮, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, জুইস সেটেলমেন্ট, প্যালেস্টাইনী সুইসাইড মিশন এবং ইসরাইলী সামরিক অভিযান।

প্যালেস্টাইনীদের বর্তমান জীবন

মধ্যপ্রাচ্যের আরেক নাম হয়েছে সার্বক্ষনিক যুদ্ধ ও সংঘাতের এলাকা। বিশেষ করে প্যালেস্টাইনী-ইসরাইলী দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিকভাবেই প্রাচীন। এ সংঘাতের কারণ নিয়ে সবসময় দু’পক্ষ একে এপরকে দোষ দিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দু’পক্ষই নিরাপত্তাহীন জীবন কাটাচ্ছে। তবে পরাধীন হিসাবে প্যালেস্টাইনী জীবনযাত্রায় ভোগান্তি অনেক বেশী। ইসরাইলী দখলে প্যালেস্টাইনী জীবনযাত্রা বিশে-ষণ করতে হলে অনেকগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ইস্যু (প্যালেস্টাইনী স্বাধীনতা, পূর্ব জেরুজালেম, উদ্বাস্তু পূণর্বাসন, জাতীয় পরিচিতি, ইসরাইলী নিরাপত্তা ইত্যাদি) আলোচনা করতে হবে। বর্তমান সীমিত প্রবন্ধে সবগুলো ইস্যুর সিস্টেমেটিক ও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমি এখানে প্যালেস্টানী জীবনযাত্রার খন্ড খন্ড কিছু প্রধান ইস্যুর উপর আলোকপাত করছি।

ইসরাইলী দখল প্যালেস্টাইনী জীবনে জাতীয় পরিচিতির (national identity) সংকট তৈরী করেছে। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর Nadim Rouhana (Univ. of Mass., Boston)-এর গবেষণায় প্যালেস্টাইনীদের ৬/৭টা পরিচিতিতে দেখানো হয়েছে (Palestinian, Palestinian Arabs, Palestinian Arabs in Israel, Palestinian Israeli,...)। এই খন্ড খন্ড পরিচিতি প্যালেস্টাইনীদের একক জাতীয় সত্তা ও পরিচিতি গঠনে সহায়ক নয়। ইসরাইলী দখলে প্যালেস্টাইনীদের জন্যে এটা একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ও পরাজয়।

মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা যায় উদ্বাস্তু জীবন কখনও স্থিতি ও উন্নয়নশীল নয়। জাতিসংঘের (UNWRA) হিসাবে প্রায় ৩৮ লাখ পালেস্টাইনী ও তাদের উত্তরসূরী জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, ওয়েস্ট ব্যাংক এবং গাজাতে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করছে। তাছাড়া Palestinian Right of Return Coalition কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে আরো প্রায় ২০ লাখ প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু বিভিন্ন আরব দেশে বাস করছে এবং তাঁরা জাতিসংঘের সাহায্য কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর Rashid Khalidi (Univ. of Chicago) প্যালেস্টাইনী জাতীয় পরিচিতি প্রসঙ্গে তাঁদের নিত্যদিনের সমস্যার কথা উলে-খ করেন।

ঘর/শিবির থেকে বের হলেই প্যালেস্টাইনীরা পদে পদে নিরাপত্তা তল-াসীর আওতায় আসে। কখনো কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের রাস্তায় বা বাসে/ গাড়ীতে বসে থাকতে হয় নিরাপত্তা তল-াসী শেষ করার জন্যে। মানসিকভাবে সবচেয়ে পীড়াদায়ক হলো যে ইসরাইলী কর্মকর্তারা প্যালেস্টাইনীদের সব সময় সন্দেহ ও মানবেতর দৃষ্টিতে বিচার করেন। কয়েকমাস পূর্বে CNN-এর এক রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে দীর্ঘায়িত নিরাপত্তা তল-াসীর শিকার হাসপাতালগামী এক অন্তঃসত্তা প্যালেস্টাইনী মহিলা অপেক্ষারত গাড়ীতে সন্তান প্রসব করছেন। ম্যাডিকেল সাহায্য ও যত্নের অভাবে নবজাতকটি মারা যায়। পরাধীন প্যালেস্টাইনীদের জীবনযাত্রা এরচেয়ে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক হতে পারে কি?

ইসরাইলী দখলে প্যালেস্টাইনী অর্থনীতির স্বনির্ভরতা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে গেছে। অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কের First Run Icarus Films কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রামান্য ভিডিও (Close, Closed, Closure by Ram Loevy) দেখানো হয়েছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী দারিদ্রভারে জর্জরিত একটা এলাকা হলো ১১১ বর্গমাইলের গাঁজা স্ট্রিপ। এখানকার প্রায় ১০ লাখ প্যালেস্টাইনী মূলত জেলখানায় কয়েদীদের মতো জীবনযাপন করছে। তাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত ইসরাইলী অর্থনীতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে।

The Society for International Development জার্নালে প্রকাশিত David Bartram-এর প্রবন্ধে দেখা যায় ওয়েস্ট ব্যাংক ও গাজা থেকে আসা প্যালেস্টাইনী শ্রমিকদের প্রায় অধিকাংশই ইসরাইলী নির্মান ও কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। কিন্তু প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘাত তাদের কর্মজীবন ও উপার্জনের পরিমাণকে অনিশ্চিত করে রাখে। সম্প্রতিকালে ইসরাইলীরা রোমানিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন থেকে শ্রমিক আমদানী করছে। David Bartram-র বিশে-ষণ ইংগিত দেয় যে, বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক আমদানি প্যালেস্টাইনীদের শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগকেই সীমিত করবে না, প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের ইসরাইলে পূনর্বাসনের ডায়ালগকেও আরো জটিলতর করবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত Samah Jabr এবং Betsy Mayfield-এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্যালেস্টাইনীদের সামাজিক জীবন নেই বললেই চলে। ইসরাইলী কারফিউ এবং ইসরাইলী সৈন্য ও ইসরাইলী settler-দের অপারেশনের ভয়ে প্যালেস্টাইনীরা বিকেল ৩/৪টার মধ্যে কাজ বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে। প্যালেস্টাইনী বসতগুলো সন্ধ্যা ৬টার পর মূলত ভৌতিক শহরে পরিণত হয়। সারাদিনের কাজের পর আমেরিকাতে যেমন পার্টি বা বিনোদনের (সিনেমা ও খেলাধুলা) সুযোগ রয়েছে, ইসরাইলী দখলে প্যালেস্টাইনে বিনোদনের বিন্দুমাত্র সুযোগ নাই। তাছাড়া স্কুল ক্যাম্পাসে আর্থিক দীনতা, মানসিক দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার প্রভাব প্রকটভাবেই প্রকাশ পায়। তদুপরি ইসরাইলী সৈন্য কর্তৃক দুস্কৃতিকারী নিধনের নামে প্যালেস্টাইনী বাড়ীঘর ও সম্পত্তির ধ্বংসসাধন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দারিদ্র, অশিক্ষা, হতাশা, ভীতি ও হত্যা ধ্বংসলীলার শিকার হচ্ছে প্যালেস্টাইনীরা। এসব ঘটনা একটা সুস্থ ও স্থিতিশীল প্যালেস্টাইনী জীবন ব্যবস্থা গঠনের প্রধান অন্তরায়।

সাংস্কৃতিকভাবে প্যালেস্টাইনী ও ইসরাইলীদের মধ্যে লক্ষনীয় প্রভেদ দেখা যায়। ইসরাইলীরা বর্তমানে পশ্চিমা আইডিয়োলজীতে বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত। প্যালেস্টাইনীরা এখনো মূলত নিজস্ব সনাতন মূল্যবোধেই বেশী বিশ্বাসী। Nadim Rouhana-এর গবেষণা অনুযায়ী অধিকাংশ প্যালেস্টাইনী গৃহকাজে পুরুষের (বিশেষত স্বামী) সাহায্য নিতে বা পেতে নারাজ। কিন্তু অধিকাংশ ইসরাইলী স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে গৃহকাজে অংশ নেবার পক্ষপাতি। ইসরাইলীদের সাহচর্যে থাকার পরও প্যালেস্টাইনীরা তাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখছে।

Yossi Halevi-র লেখা থেকে দেখা যায় যে বিশেষকরে প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু শিবিরে/কমিউনিটিতে সমকামীদের সংখ্যা বাড়ছে। সমকামীতা প্যালেস্টাইনী দৃষ্টিতে (বিশেষ করে মুসলিম প্যালেস্টাইনী কমিউনিটিতে) নিষিদ্ধ। প্যালেস্টাইনীদের মতে সমকামীতা এক সামাজিক সমস্যা। কঠিন শাস্তি এড়ানোর জন্যে শত শত সমকামী প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু শিবির ত্যাগ

করে ইসরাইলে আসছে। ইসরাইলী সমাজ যৌন মনোভঙ্গির (sexual orientation) উপর বেশ উদার। অগ্রহণযোগ্য যৌন মনোভঙ্গি পোষণ ও প্রাকটিস করার জন্য প্যালেস্টাইনী এলাকায় সমকামী প্যালেস্টাইনীদের স্থান নেই। এদিকে অবৈধ অবস্থানের ইসরাইলে তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা নেই। বরং পুলিশে ধরা পড়া ও বিতাড়িত (deportation) হবার ভয়ে তারা সবসময় তটস্থ থাকে।

Faisal Aziza, Adital Ben-Ari (Univ. of Haifa) গবেষণা থেকে দেখা যায় ইসরাইলে বসবাসরত বেশ কিছু Israeli Palestinian কর্মজীবনে প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করছেন। এদের সাফল্য অন্যান্য প্যালেস্টাইনীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বিশেষ করে শিক্ষা ও কর্ম দ্বারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য। ইসরাইলে বসবাসরত আরব/প্যালেস্টাইনী প্রফেশনালরা বিভিন্ন ধরনের self-help এবং স্বেচ্ছা প্রকল্পের দিকে মনোনিবেশ করছেন। এসব কাজকর্ম দিয়ে তারা সীমিত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে নিজেদের এবং স্বীয় কমিউনিটির লোকজনদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টা নতুন জীবন গ্রহনের ইংগিত দেয়। যুদ্ধ বা সংঘাত নয়, শান্তিপূর্ণ ও গঠনশীল সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ জাতীয় পরিচিতি ও প্রবৃদ্ধিকে নিশ্চিত করবে। বিবেকপূর্ণ ও শান্তি প্রয়াসী নতুন প্রজন্মের প্যালেস্টাইনী ও ইসরাইলীরা যৌথভাবে কাজ করে দু'পক্ষের জন্যেই সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল জীবনব্যবস্থা গড়তে পারে।

শেষের কথা

ইসরাইলী দখল প্যালেস্টাইনী জীবনকে করেছে ছিন্নভিন্ন ও অনিশ্চিত। গত ৫৪ বছর যাবৎ প্যালেস্টাইনীরা সংগ্রাম করে যাচ্ছে মাতৃভূমি ফেরত পাবার জন্যে। বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলীর আলোকে প্যালেস্টাইনীদের বিগত ৫৪ বছরের দুঃখ, সংগ্রাম ও সংঘাতকে নতুন আঙ্গিকে দেখতে হবে। প্যালেস্টাইনীদের (এবং ইসরাইলীদের) উচিত বর্তমানকে Positive Psychology-র (Dr. M. Seligman, Univ. of Pennsylvania; Dr. M. Csikszentmihalyi, Claremant Graduale Univ.) সূত্র দিয়ে মূল্যায়ণ করা। পৃথিবীতে স্বীয় সাফল্য ও প্রতিশোধ মনোবৃত্তিকে উপেক্ষা করে আশা, মানব জাতির সাফল্য ও সহযোগিতার মনোভাব ও কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিতে হবে। শান্তি, সমৃদ্ধি এবং জাতীয় পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা সবার জন্যেই প্রয়োজন। এতে সুচিন্তিত ইসরাইলী ও প্যালেস্টাইনীদের মধ্যে দ্বিমত থাকার কথা নয়। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে 'nobody wins a war'। কথাটা খুবই প্রযোজ্য। প্যালেস্টাইনীদের সুইসাইড বোমা ও ইসরাইলী সৈন্যদের সামরিক অভিযান দু'পক্ষের লোকজনদের জীবনে দুঃখ ও কষ্ট বাড়াচ্ছে।

দুই প্রতিবেশী কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন পাশাপাশি শান্তিতে থাকতে পারে, তেমনি করে ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনও দুই প্রতিবেশী দেশ হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট বুশের প্যালেস্টাইনী রাষ্ট্র স্থাপনের গঠনমূলক চিন্তাভাবনা প্যালেস্টাইনী-ইসরাইলী সংঘাত নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। সুশৃঙ্খল মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে প্রগতিশীল ও শান্তিমূলক কর্মসূচীর কোন বিকল্প নেই। মহাত্মা গান্ধী ঠিকই বলেছেন 'We must become the change we want to see'। সুতরাং প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সংকট নিরসন করে এ এলাকায় যদি সুস্থ ও সুন্দর জীবন ব্যবস্থা আনতে হয়, তাহলে প্যালেস্টাইনীদের যেমন সুইসাইড বোমা বন্ধ করতে হবে তেমনি করে ইসরাইলী দখল ও সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে। ❑

ডুরাঙ্গো, কলরাডো

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ফিলিস্তিন সমস্যা

গোলাম মোর্তোজা

এক চিরন্তন সমস্যার নাম ফিলিস্তিন। যাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, নেই জীবনের নিরাপত্তা। একটি জাতির ওপর এমন অন্যায় অবিচারের ইতিহাস পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। মানবতাবিরোধী এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো সোচ্চার ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের প্রতিটি পত্রিকায় প্রথম পাতায় স্থান পায় ফিলিস্তিনীদের যে কোনো বড় আক্রমণের খবর। ইসরাইল ইয়াসির আরাফতকে অবরুদ্ধ করে রাখার সময়কালে দেশের সব পত্রিকাই বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। আরাফাতের বিকল্প খোঁজার বিষয়টি বাংলাদেশের মানুষ এবং সাংবাদপত্র ভালোভাবে নেয়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের কড়া নির্দেশ - স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র চাইলে বদলাতে হবে বর্তমান নেতৃত্ব। আর বর্তমান নেতৃত্ব মানেই তো ইয়াসির আরাফাত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য পলিসির যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাকে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে নতুন নেতৃত্বের কথা বলেছেন: 'শান্তির জন্য প্রয়োজন একটি নতুন ও ভিন্ন প্যালেস্টাইনি নেতৃত্ব, যাতে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের জন্ম হতে পারে।' কিন্তু বিশ্বের অনেক নেতৃবৃন্দই বুশের এই শর্তারোপের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি বে-য়ার, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাঁ ক্রাতে, জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানসহ অনেকেই দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, আরাফাতকে উৎখাতের 'বুশ পলিসির' সমর্থন তারা করেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ওয়াশিংটনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। ইসরায়েলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও এ অঞ্চলের যে কোনো শান্তি উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম অংশীদার। প্রেক্ষাপট যখন এই, আরাফাতকে উৎখাতের বুশ ঘোষণাকে বিশে-ষকরা নানা দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আরাফাতের বিকল্প আদৌ সম্ভব কিনা এবং কে অথবা কারা হতে পারেন আরাফাতের যোগ্য উত্তরসূরি বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি বিষয়ে ইত্তেফাক বলেছে, আরাফাতকে সরিয়ে দেয়ার যে শর্তই বুশ আরোপ করুন না কেন, খোদ বুশ প্রশাসনেই এ নিয়ে সন্দেহ আছে। বিশেষত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল এ ধরনের বিধিনিষেধ নির্ধারণের ব্যাপারে সন্দিহান। যদিও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কনডোলিজ্জা রাইস অপেক্ষাকৃত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি; পাওয়েল মনে করেন এক্ষেত্রে ইসরায়েলের দায়িত্বও কম নয়, যখন ইসরাইলী বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা আরাফাতের পক্ষে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর মতো সশস্ত্র প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ একরকম অসম্ভব।

প্রথম আলোর গত মাসের রিপোর্ট ছিলো এরকম, আসলে আরাফাত একটি ইতিহাস। ইঞ্জিনিয়ার যে মানুষটি ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়েছেন এবং পরবর্তীতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন, যার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার, আজকে সহসা তাকে দৃশ্যপটের বাইরে ঠেলে দেয়া যে কতটুকু অবিবেচনাপ্রসূত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আরাফাতকে উৎখাতের 'বুশ পলিসি' আসলে একান্তই 'শ্যারোনীয়' পলিসি। এ ব্যাপারে খোদ ইসরায়েলিরাও কম বিস্মিত নয়। জেরুজালেম পোস্টের রিপোর্টার ডেভিড হরোউইটজ 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও'কে বলেছেন, 'শ্যারন সরকার ভাবতে পারেন ভাষণটি তারাই লিখেছেন'। এহেন প্রো-ইসরায়েলি নীতিতে আরাফাতকে শান্তি আলোচনার পক্ষে

অনুপযুক্ত আখ্যা দেয়া হবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। আসলে আরাফাতকে প্যালেস্টাইনি নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার নীতি একান্তই ইসরায়েলের। কিছুদিন আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী শ্যারন ঘোষণা করেছিলেন, '৮২ সালে বৈরুতে আরাফাতকে হত্যা না করে তিনি ভুল করেছিলেন। দিন কয়েক আগে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার এক বিবৃতিতে বলা হয় 'প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষ যখন সত্যিকার সংস্কার সাধন করবে এবং এর মাথায় বসবে নতুন নেতৃত্ব, কূটনৈতিক উপায়ে সামনে এগুনোর পথগুলো নিয়ে আলোচনায় বসা কেবল তখনই সম্ভব।' ইসরায়েলি বিবৃতি এবং প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্যের এত অদ্ভুত মিলকে কাকতালীয় বলা যায় না। বরং উভয় পক্ষের নীতিগত মিল থাকলেই এমনটা সম্ভব। ইয়াসির আরাফাত অবশ্য প্রেসিডেন্ট বুশের ঘোষণার কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। তিনি বুশের ভাষণকে 'গঠনমূলক' হিসেবে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, নেতৃত্ব পরিবর্তন বলতে বুশ তাকে বোঝাননি। আরাফাতের অসহায়ত্ব এখানে পরিষ্কার। প্রেসিডেন্ট বুশকে চ্যালেঞ্জ করার সামর্থ্য তার নেই। আরাফাত কেবল নীরব থেকে ভরসা করতে পারেন তার জনগণের ওপর। ইতিমধ্যে তিনি সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন, যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছরের ১০-২০ জানুয়ারি। এই নির্বাচনে তার জয়লাভই হবে বুশের বক্তব্যের মোক্ষম জবাব। সাম্প্রতিক জরিপও সেই সম্ভাবনার কথাই বলছে। এর আগে ১৯৯৬ সালে প্যালেস্টাইনের ইতিহাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আরাফাত ৯০ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। গত মাসে 'প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর পলিসি এন্ড সার্ভে রিসার্চ' ১৩১৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক প্যালেস্টাইনির মধ্যে জরিপ চালায়। তাতে দেখা যায়, জনপ্রিয়তায় সামান্য ভাটা এলেও আরাফাতই নির্বাচিত হবেন প্যালেস্টাইনিদের নেতা। সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের ভূমিকা কি হবে অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। বুশের 'কথামত' নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন না করার 'অপরাধে' বলির পাঁঠা হবেন প্যালেস্টাইনি জনগণ। আর স্বাধীন স্বদেশ? সে তো আকাশ কুসুম কল্পনা। কেননা, প্রেসিডেন্ট বুশ যে ফ্রেমওয়ার্ক ঘোষণা করেছেন তাতে পরিষ্কার বলা আছে, 'আমি প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের... এবং যখন প্যালেস্টাইনি জনগণ গ্রহণ করবেন নতুন নেতা, নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্র প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে সমর্থন জানাবে...।' কিছুদিন আগে আরাফাত ইসরায়েলি গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তার প্রশাসনে পরিবর্তন আনবেন। আরাফাতের সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মন্ত্রীপরিষদ সদস্যরা পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক, ত্বরিত সংস্কার সাধন আরাফাতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য তিনি একজন নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম ঘোষণাও করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করার জো নেই, হাত-পা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে আরাফাতকে সাঁতার কাটতে বলা হচ্ছে, যা তার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব নয়। এখন দেখা যেতে পারে প্যালেস্টাইনি জনগণের সামনে আরাফাতের বিকল্প বেছে নেয়ার কি সুযোগ আছে। পর্যবেক্ষকরা বেশ কিছু নাম প্রস্তাব করেছেন। এদের একজনের এ মাসেই দুবার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে। অন্যজন প্যালেস্টাইনি প্রতিরোধ সংগ্রামের বিপ-বী নেতা। তৃতীয়জন আছেন ইসরায়েলের কারাগারে। চতুর্থজন নেতৃত্ব দিচ্ছেন কট্টরপন্থী একটি মিলিশিয়া গ্রুপের। এই চার নেতৃস্থানীয় প্যালেস্টাইনি হচ্ছেন সংসদের স্পিকার আহমেদ কোরেই, আরাফাতের ডেপুটি মাহমুদ আব্বাস, ফাতাহ মিলিশিয়া নেতা মারওয়ান বারগোতি এবং সাবেক গাজা সিকিউরিটি চীফ মোহাম্মদ দাহলান। এছাড়াও আছেন পশ্চিম তীরের নিরাপত্তা প্রধান জিবরিল রাজুব। কিন্তু এরা বুশের 'সন্ত্রাসের সঙ্গে আপোসহীন' নেতার পর্যায়ে পড়েন কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বলাই বাহুল্য, এদের কেউই আরাফাতের প্রবাদতুল্য জনপ্রিয়তা ও ক্যারিশমার ছিটেফোঁটাও ধারণ করেন না।

যুগান্তর ফিলিস্তিন সমস্যাকে দেখছে এভাবে, আরাফাতের প্রশাসনে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আহমেদ কোয়েরি। আবু আলা নামেও তিনি পরিচিত। ১৯৯৩ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পাদিত অসলো চুক্তির অন্যতম আলোচক। কোয়েরি বর্তমানে প্যালেস্টইনি অ্যাসেম্বলির স্পিকার এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে আরাফাত মারা গেলে তিনিই প্যালেস্টাইনি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। জেরুজালেমের কাছে আবু দিসের এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম নেয়া ষাটোর্ধ্ব কোয়েরি অনেক সাধারণ প্যালেস্টাইনির চোখে একজন অভিজাত ব্যক্তি। প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার আগে তিনি ছিলেন পিএলও'র একজন অর্থ কর্মকর্তা। সর্বসাম্প্রতিক ২১ মাস বয়সী প্যালেস্টাইনি গণজাগরণের পুরোটা সময় সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্য কোয়েরি সর্বদা ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। দুবার হার্ট সার্জারির পর তিনি এখন সুস্থতার পথে।

আরাফাতের আরেক সম্ভাব্য উত্তরসূরি মাহমুদ আব্বাস। প্রায় ৭০ বছর বয়সী আরাফাতের ডেপুটি আবু মাজেন নামেও সমধিক পরিচিত। তিনি আরাফাতের ফাতাহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে পিএলও'র এক্সিকিউটিভ কমিটির মহাসচিব। অসলো চুক্তির সময় আব্বাস ছিলেন পিএলও'র কর্মকর্তা। ১৯৯৫ সালে তিনিই প্রথম প্যালেস্টাইনি নেতা হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমের কিয়দংশে ইসরায়েলি দাবি মেনে নেন। পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের চোখে তিনি মধ্যপন্থি। বাস্তবতাবোধ এবং সামরিক অনভিজ্ঞতার কারণে তিনি প্যালেস্টাইনিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ব্যাপারে তেমন আশাবাদী নন। অন্যদিকে, ৪২ বছর বয়স্ক ফাতাহ মিলিশিয়া নেতা বারগুতি ঠিক এর বিপরীত। সাম্প্রতিককালে ইসরায়েলের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধে নামা আল-আকসা মার্টার্স ব্রিগেডের তিনি বিশ্বস্ত নেতা। ইসরায়েলিদের হাতে বন্দী হবার পর তার জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী রকেট হামলা চালিয়ে হত্যা করে তার ছেলেকে। বারগুতির রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র বির জেইত বিশ্ববিদ্যালয় এবং রামাল-য় প্যালেস্টাইনি উদ্বাস্তু শিবির। পশ্চিম তীরে অভিযান চালানোর সময় ১৫ এপ্রিল ইসরায়েলি বাহিনী তাকে গ্রেপ্তার করে। পশ্চিম তীরের একজন কৃষকপুত্র বারগুতি অনর্গল হিব্রু বলতে পারেন। সাম্প্রতিক ইন্তিফাদা শুরুর আগে তিনি ইসরায়েলিদের পছন্দের একজন ছিলেন। বিক্ষোভ, শেষকৃত্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বারগুতির উপস্থিতি এবং ইসরায়েলি দখলদারিত্বে অবসান চেয়ে আরব প্রেসের কাছে খোলামেলা বক্তব্য তাকে সাধারণ প্যালেস্টাইনিদের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। ইসরায়েল বলছে, তারা বারগুতির বিচার করবে। তবে তাকে বহিষ্কার করাও হতে পারে।

৪১ বছর বয়সী মোহাম্মদ দাহলান অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের নেতাদের অন্যতম। যুদ্ধ না আলোচনা - এ ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকায় জনপ্রিয়তা হারালে সম্প্রতি তিনি গাজা প্রিভেন্টিভ সিকিউরিটির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ইসরায়েলিদের অভিযোগ, গাজায় অনেকগুলো হামলার জন্য তিনিই দায়ী। কিন্তু দাহলান আরাফাতের একজন সিনিয়র উপদেষ্টা হবার আশা পোষণ করেন। তিনি ইসরায়েল এবং সিআইএ-র সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনায় প্যালেস্টাইনি পক্ষের হয়ে অংশ নেন। তিনি গাজায় চরম নিরাপত্তা সংস্থার নেতৃত্ব দিতেন, যা তাকে সেখানে প্রভাবশালী করলেও সাধারণ প্যালেস্টাইনিদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করেছে। ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র তাকে শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম অংশীদার হিসেবে পেতে চায়।

কঠিন মানুষ বলতে যা বোঝায়, জিবরিল রাজুব ঠিক তাই - রূঢ়, নিষ্ঠুর। পশ্চিম তীরের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান হিসেবে ইসলামী মিলিশিয়াদের ওপর দমন-পীড়ন চালান। এভাবে তিনি নজর কাড়েন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের। ফেব্রুয়ারিতে আরাফাতের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়। পরে যদিও রাজুব বলেছেন তিনি আরাফাতের প্রতি বিশ্বস্ত, তাদের সম্পর্ক আগের মতো আর গভীর নয়।

মূলতঃ এরাই বিবেচিত হচ্ছেন আরাফাতের সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে। কিন্তু তারা কি আরাফাতের সমকক্ষ বিকল্প হতে পারবেন? সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। ❑

লেখক পরিচিতিঃ গোলাম মোর্তোজা ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত সাংবাদিক।

বেলফ্যুর ডিক্লারেশন/সিসিল রোডস থেকে বুশ ডকট্রীন
বিপন্ন নোবেল লোরিয়েট ইয়াসীর আরাফাত
পোয়েট লোরিয়েট আমিরী বারাকা

দেওয়ান শামসুল আরেফীন

এগারোই সেপ্টেম্বর খবর আসল চেহারাটিকে একেবারে নগ্নভাবে বের করে দিচ্ছে। নিউ জার্সির পোয়েট লোরিয়েট আমেরিকার অন্যতম প্রধান কবি আমিরী বারাকা ১১ সেপ্টেম্বরকে উপলক্ষ্য করে 'Somebody Blew up Amrica' শিরোনামে ৬ পৃষ্ঠা দীর্ঘ একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি ছিল এরকমা :

'Who knew the World Trade Center
Was gonna get bombed
Who told 4000 Israeli Workrs at the
Twin Towers
To stay home that day
Why did Sharon stay away?'

অ্যান্টি ডিফেমশন লীগ অফ আমেরিকা (নিউ জার্সি) এবং ইউনাইটেড জুয়িল কমিউনিটি অফ মেট্রো ওয়েস্ট নিউ জার্সি পংক্তিগুলোক 'এ্যান্টি সেমিটিক' বলে আখ্যায়িত করে নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর জিম ম্যাকগ্রীভির কাছে অঙ্গরাজ্যের পোয়েট লোরিয়েটের পদ থেকে আমিরী বারাকার অপসারণ দাবি করে। আইগত সীমাবদ্ধতার কারণে ম্যাকগ্রীভি কবিকে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলে তিনি তাকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানান। কবি বারাকা পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়ে দেন। বলেন, তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্যাসিজম বিরোধী ইহুদী বিদ্বেষ বিরোধী, 'ইহুদী বিদ্বেষী বা এন্টি সেমিটিক' নন মোটেও। হলেও হতে পারেন ইসরাইল বিরোধী। তার দাবির সপক্ষে কবিতাটি থেকে আরো দুটি লাইন উলে-খ করেন। লাইন দুটো হলো :

'Who put the Jews in ovens!
and who helped them do it'

ইসরাইলের 'ইহুদীবাদ' এবং 'ইহুদীবাদ' সংক্রান্ত সন্ত্রাস যেমন ইসরাইলের অস্তিত্বের প্রশ্নে কাজে এসেছে, তেমনি এটা কাজে এসেছে বিশ্ব উপনিবেশবাদের। আরব প্রতিরোধ ঠেকাবার জন্য তাদেরকে কখনো পর্যায়ক্রমে, কখনো সহযোগে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও বিভিন্ন উপনিবেশবাদী শক্তির শরনাপন্ন হতে হয়েছে। একটি সময়ে ইউরোপীয় শক্তি সমূহের ঐ অঞ্চলে এক 'অনুগত জনগোষ্ঠীর' প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে লর্ড পামারস্টোন ইউরোপের ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে অভিভাসনের অনুমোদন দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। বলেন, এতে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। ভারত ছিল ব্রিটিশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ 'জুয়েল ইন দি ক্রাউন'। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের কাচামাল তুলা সরবরাহের সিংহভাগই আসতো ভারত থেকে। বৃটেনের উপর সর্বতোভাব নির্ভরশীল এবং বন্ধুত্বভাবাপন্ন একটি সম্প্রদায়কে প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষিত হয়। তিনি বলেন, ইহুদীদের দিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। ১৮৭৬-এ লর্ড শ্যাফটসবারী কানাডা থেকে কোলকাতা, অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে ঐ একই কথা অর্থাৎ সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইনের গুরুত্ব অতুলনীয় বলে উলে-খ করেন। উপনিবেশ মন্ত্রী জোসেফ চ্যাম্বারলেইন অবশ্য ইহুদীদের বাসস্থান হিসেবে উগান্ডার নাম প্রস্তাব করেছিলেন যেমন অপর একজন ক্ষমতাধর ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এক পর্যায়ে আর্জেন্টিনায় ইহুদীদের অভিভাসন উৎসাহিত করতে বলেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে উলে-খযোগ্য উপনিবেশী বক্তব্য পেশ করেন সিসিল রোডস। তিনি বলেন, গতকাল আমি লন্ডনের ইস্ট এন্ড (শ্রমিক শ্রেণীর আবাসস্থল) গিয়েছিলাম এবং সেখানে বেকার শ্রমিকদের এক সভায় উপস্থিত হই। তাদের ক্ষুব্ধ বক্তৃতাসমূহ শুনি যাতে তারা চীৎকার করে চাল চুলোর দাবি করছিল। ঘরে ফেরার পথে আমি ঐ দৃশ্য নিয়ে ভাবতে থাকি এবং আগের থেকে আরো বেশী করে সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্যতার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। বৃটেনের ৪০ মিলিয়ন নাগরিককে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচাতে হলে, অতিরিক্ত প্রান্তিক জনসংখ্যাকে বাঁচাতে হলে যে করেই হোক আমাদের নতুন জায়গা দখল করতে হবে এবং কারখানায় উৎপন্ন সামগ্রীর জন্য নতুন বাজারের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আগেই বলেছি রাজ্য এবং রাজত্ব রুটি মাখনের উর্ধ্বের কোন বিষয় নয়। গৃহযুদ্ধ এড়াতে হলে, সাম্রাজ্যবাদী না হয়ে উপায় নেই। এ মুহূর্তে 'জায়োনিজম' কে ব্রিটিশ ঝুঁজিবাদ সর্বোৎকৃষ্ট অবলম্বন বলে মনে করে এবং তার প্রতিফলন ঘটে ১৯১৭-এর ২ নভেম্বর ধনাঢ্য ইহুদী লর্ড রথ রথস চাইল্ডকে লিখা লর্ড বেলফ্যুয়ের চিঠিতে। এই চিঠিতে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে জাতীয় বাসভূমি স্থাপনের প্রশ্নে ব্রিটিশ সমর্থনের কথা উলে-খ করা হয়। এটিই পরবর্তীতে ঐতিহাসিক বেলফ্যুর ঘোষণা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উলে-খ্য, এই ঘোষণা 'ইহুদী নয়' প্যালেস্টাইনের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সুকৌশলে দীর্ঘদিন গোপন রাখা হয়। উলে-খ্য, সে সময়েও প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশ ছিল 'ইহুদী নয়' সম্প্রদায় এবং তারাই ছিলেন ৯৫ শতাংশ ভূমির মালিক। অর্থনৈতিক স্বার্থ উৎসারিত ব্রিটিশ রাজনীতি বরাবরই ইসরাইলের অনুকূলে পরিচালিত হয়।

এই রাজনীতি আমেরিকাকেও স্পর্শ করে। উলে-খ করার মতো ঘটনা হলো এই যে বেন গুরিয়ন যখন কেইম ওয়াইজম্যানের পরামর্শে ১৯৪৮-এর ১৫ মে সন্ধ্যা ৬টায় ইহুদী রাষ্ট্র হিসেবে 'ইসরাইল'-এর ঘোষণা দেন, ঠিক তার ১১ মিনিট পরে অর্থাৎ ৬টা ১১ মিঃ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উক্ত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেন। ১৯৭৩-এর ১৩ নভেম্বর ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাকালে সকলের সমর্থন চেয়ে বলেন, আমার এক হাতে শান্তির সবুজ গুল্ম এবং আরেক হাতে মুক্তিযোদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, তোমরা আমার হাত থেকে শান্তির গুল্ম ঝরতে দিও না। জাতিসংঘের ১০৫টি দেশ প্যালেস্টাইনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং পিএলওকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদান করে। যে ৪টি দেশ বিরুদ্ধে ভোট দেয় তারা হলো ইসরাইল, বলিভিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জানুয়ারি ১৯৭৬-এ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে প্যালেস্টাইনিদের জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতির প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে। বর্তমানের মাথাপিছু আয় ১৭,০০০ ডলার (মার্কিন আয় ২১,০০০ ডলার), ৬ মিলিয়ন সংখ্যার (যার ২০ শতাংশ আরব) এই দেশকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিরাপত্তার সার্বিক নিশ্চয়তা দিতে চেয়েছিলেন। গোল্ডামায়ার অবশ্য উত্তরে বলেন, আপনারা যতক্ষণে এখানে এসে পৌঁছুবেন, ততক্ষণে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। ইসরাইল দীর্ঘকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সমর্থন ও সাহায্য

পেয়েছে। আর্থিক সাহায্য গড়ে বছরে ৫/৬ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে, তাদের আনবিক প্রকল্পে মৌন সমর্থন পেয়েছে অব্যাহত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসবই করেছে আর্থিক উপনিবেশী সুবিধা নিশ্চিতকরণের তাড়নায়। এ কথাটি ইদানিং আরও স্পষ্ট হয়েছে জর্জ বুশ এবং ব্রেন্ট স্কোক্রফ্টের আত্মজীবনমূলক বই 'এ ওয়ার্ল্ড ট্রান্সফর্মড'-এ। পারস্য উপমহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্কোক্রফ্ট স্বীকার করেন বিশ্বের তেল সরবরাহের বড়ো একটা অংশ যাতে আমাদের বিরোধী কোন আঞ্চলিক শক্তির কাছে জিম্মি না হয়ে পড়ে, সেটা নিশ্চিত করাই ছিল আমাদের ঐ তৎপরতার বিশেষ কারণ।

এই সেই দিনও ৮৬ জন সিনেটরসহ (চার্লস সুমারের নিকট গত ৩রা নভেম্বরে নির্বাচনে পরাভূত ডি এ্যামাটোসহ) হাউস স্পিকার গিংগ্রীচ ইসরাইলের পক্ষে বিবৃতি দেন। গত ২৬ মে ইসরাইলের পার্লামেন্ট নেসেটে গিংগ্রীচ বলেন, অখন্ডিত জেরুজালেম ইসরাইলের সর্বকালের। তিনি এক সাক্ষাৎকারে ম্যাডেলীন অলব্রাইটকে প্যালেস্টাইনিদের দালাল বলে আখ্যায়িত করেন। সে সময়ে কর্মরত হোয়াইট হাউস মুখপত্র মাইক ম্যাককারী স্পিকার থেকে দূরত্ব টেনে বলেন, এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে স্পীকার পররাষ্ট্র ব্যাপারে বেশ খানিকটা পক্ষপাত ঢুকিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, অলব্রাইট আমেরিকার জনগণের বাইরে অন্য কারো অনুগত এটা একটি মারাত্মক আপত্তিকর উক্তি বা অভিযোগ। এ ধরনের উক্তি থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। ইসরাইলের প্রতি আমেরিকার একপেশে একচেটিয়া 'মনোলিথিক' দুর্বলতার পরিবর্তন আসে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের উদ্যোগে অর্জিত আনোয়ার সাদত এবং মেনাহিম বেগিমের মধ্যেকার ক্যাম্প ডেভি চুক্তির (১৯৭৮) মধ্যে দিয়ে। ঐ চুক্তির পথ ধরেই আসে অসলো চুক্তি যে চুক্তি ১৯৯-এর মে মাসের মধ্যে ইসরাইল এবং প্যালেস্টাইনের স্ব স্ব ভৌগোলিক, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়। চুক্তিটি কার্যত ১৮ মাস জীবন্মৃত অবস্থায় থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এই অবস্থার প্রকৃত গুণগত পরিবর্তন আনেন মেরীল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আরাফাত নেতানানুহুর মধ্যেকার আলোচনার মধ্যে দিয়ে। নেতানানুহু কিছুদিন আগে বলেন, যে অঞ্চল আমরা রক্ত দিয়ে দখল করেছি তা কখনো দ্বিধাবিভক্ত হতে দেব না। সেই নেতানানুহুকে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশে লোহা গিলতে হয়েছে। জর্জ উইল ৭ মে ১৯৯৮ লিখেন ইসরাইল প্রিকারস সারভাইবাল টু পিস প-্যান। যে পিস প-্যানে ল্যান্ড ফর পিসের কথা বলা হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো এই যে অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য যারা ই সমস্যার সৃষ্টি করেছেন বা সমস্যা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তারাই আজ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। সমস্যার সৃষ্টিকর্তারাই আজ সমাধান কর্তা বনেছেন। এদের হাতে ক্রীড়নক হিসেবে খেলেছেন এবং এখনও খেলছেন। ইসরাইলিদের একাংশ ভুগেছেন এবং এখনো ভুগছেন - প্যালেস্টাইনি আরবদের সবাই এবং মধ্য মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ইসরাইলিরা। রিডার আলোচনা অনুষ্ঠানের পেছনে মোনিকা কেলেংকারির পরোক্ষ প্রভাবের সত্যতা বা অসত্যতা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে প্রগতিবাদী রাজনৈতিক কর্মী এবং চিন্তাবিদ আব্রাম লিওনের (জুরিশ কোয়েশ্চেন প্যানথার প্রেস ১৯৮০) যে কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন সেটি হলো - সাম্রাজ্যবাদের শক্তি যখন ক্রমেই কমছে বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহে সে মুহূর্তে যারা এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান ইসরাইলের ব্যাপারে তাদের সচেতন হবার সময় এসেছে। উপনিবেশবাদ এবং ইসরাইলের এই দুর্বল মুহূর্তে প্যালেস্টাইনিরা যতটুকু সুযোগ সুবিধা পাবে ততটুকু গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যৎ গড়বে সেটাই স্বাভাবিক।

জনৈক ভাষ্যকার পল মুলশীন বলেন, আমিরী বারাকা জেমস ব্যালডউইন, ল্যাংস্টন হিউগস সমমাপের একজন কবি। বীটস জেনারেশনের কবি 'এ্যালেন গীনসবার্গের' ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। গীনসবার্গ নিজেই ছিলেন ইহুদী। আমেরিকার অপর দু'জন শ্রেষ্ঠ কবি টিএস ইলিয়ট এবং এজরা পাউন্ড ছিলেন এন্টি সেমিটিক। তারা তেমন বিতর্কের ইস্যু হননি। ১১ সেপ্টেম্বর যেটা করেছে আমিরী বারাকার ক্ষেত্রে। নিউ জার্সি কংগ্রেস কবিকে পোয়েট লোরিয়েট পদ থেকে অপসারণ করার ক্ষমতা গভর্নরের উপর অর্পণ করে একটি আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে ৬টি বিল উত্থাপন করেছে। গভর্নর ইতোমধ্যে পোয়েট লোরিয়েটের সম্মাননা ভাতা ১০ হাজার ডলার ফ্রিজ করে দিয়েছেন। ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস, সার্বভৌমত্ব, সভ্যতার সংজ্ঞা পাল্টে দিতে বসেছে। শান্তির নোবেল লোরিয়েট, প্যালেস্টাইন তথা সারা বিশ্বের স্বাধীনতা স্বাধিকারকামী মানুষের নেতা ইয়াসীর আরাফাত প্রকাশ্য দিবালোকে দিনের পর দিন বুলডোজার এ্যারিয়েল শ্যারিনের ট্যাংক ও মিসাইল বহরে অবরুদ্ধ থাকছেন এই ১১ সেপ্টেম্বরের একান্তই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত, নির্মম অথচ ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণে। যে কারণে আরাফাতকে বুলডোজার শ্যারন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে 'Irrelevant' বলে ঘোষণা করেন এবং যে কারণে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ প্যালেস্টাইনিদের প্রধান নেতা হিসেবে নতুন মুখ দেখতে চান সেই উপনিবেশিক স্বার্থের সাযুজ্যের বিষয়টিই স্পষ্ট করেছে ১১ সেপ্টেম্বর। ❑

লেখক পরিচিতিঃ দেওয়ান শামসুল আরেফিন একজন সমাজবিজ্ঞানী।
তিনি ন্যু ইয়র্কে থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ ও ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী'র নিয়মিত কলামিস্ট।

আত্মঘাতী বোমার রাজনীতি

দীপক গুপ্ত

বৃহৎ কাজের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার ঘটনা আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে অনেকদিন যাবৎই বিদ্যমান, তবে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা তাকে দিয়েছে সম্পূর্ণ একটি নতুন রূপ।

আত্মঘাতী বোমার ঘটনা যদিও এদেশে তেমনটি ঘটেনি, পৃথিবীর অনেক কটি দেশে, বিশেষত ইসরাইল, শ্রীলংকা এবং ভারতে এর প্রকোপ দেখা গেছে সময়ে-অসময়ে। 'আত্মঘাতী' শব্দটি স্বঅর্থেই একটি চরমভাব প্রকাশের ঘটনা। আর তাই আত্মঘাতী বোমার ঘটনাগুলাকে সহজেই কিছু উগ্রপন্থী এবং চরমপন্থীর অযৌক্তিক আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে হিসাব করলে ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণের আগ পর্যন্ত এবং ইসরাইলে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বাদ দিলে আত্মঘাতী বোমায় এ পর্যন্ত মারা গেছে ৮টি দেশের প্রায় ৫৫৪ জন। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ মারা গেছে ইসরাইলে। ৩৭ শতাংশ শ্রীলংকায়, ৯ শতাংশ রাশিয়াতে এবং ৭ শতাংশ ভারতে। বাকী যেসব দেশে আত্মঘাতী বোমায় জনক্ষয় হয়েছে সেগুলো হচ্ছে তুরস্ক, পাকিস্তান, লেবানন এবং ইয়েমেন (আমেরিকার নৌবাহিনীর জাহাজের ঘটনা)।

সাধারণ মানুষের মনে একজন আত্মঘাতী সন্ত্রাসীর যে ভাবমূর্তি তা মোটামুটি এরকম - ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের একজন যুবক, জন্ম যার চরম দারিদ্রের মাঝে, অশিক্ষিত, ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী, উদ্দেশ্যবিহীন, ভয়ংকর এবং চরমপন্থী, যার হারাবার কিছুই নেই।

শহীদ হিসাবে মৃত্যু তাই তার ইহলৌকিক জীবনের সমস্যা সমাধান করে

বেহেস্তে ৭২ জন কুমারী হুরের হেরাম আর তার ইহলোকে পরিত্যক্ত পরিবারের জন্য কিছু অর্থপ্রাপ্তি। বাহিরের পৃথিবীকে সে খুব একটা চেনে না। ধর্মই তার জীবনের মূলমন্ত্র আর সে জানে গেরিলা ট্রেনিং তাকে যা শিখিয়েছে। একজন তিলে তিলে গড়ে তোলা চরমপন্থী, যন্ত্রের মতো নিয়ন্ত্রিত মানব বোমাকে, তার সব সাধারণ জ্ঞানকে নিংড়ে তাকে শিখানো হয় কিভাবে বৃহৎ সমাজের কল্যাণে নিজের জীবনকে দিয়ে দিতে হয়। অবশ্য আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের প্রোফাইল আরও অনেক জটিল। যদিও আত্মঘাতী বোমারুদের বেশির ভাগই পুরুষ, শ্রীলংকার গেরিলা গ্রুপ লিবারেশন টাইগারস অব তামিল অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছে মেয়েদের। ১৯৯১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিহত হন তাদেরই একজনের ঘটনায়। সাম্প্রতিককালে ইসলামিক মধ্যপ্রাচ্যেও অনেক মহিলা অংশ নিচ্ছেন আত্মঘাতী বোমা হিসাবে।

যদিও ৮৩ শতাংশ বোমারুই অবিবাহিত ছিলেন, তাদের অনেকেরই ঘটনার সময়কালে সক্রিয় রোমান্টিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ৬৪ শতাংশ বোমারুর বয়স ছিল ১৮ থেকে ২৩ এর মাঝে এবং ৪৭ শতাংশ বোমারুই শিক্ষিত ছিলেন।

ধর্মীয় চরমপন্থার দিক থেকে দেখলে, শ্রীলংকার গ্রুপের কোন ধর্মীয় এজেন্ডা ছিল না। এমন কি হামাস (ইসলামিক রেজিস্টেন্স মোভমেন্ট)ও সময়ের সাথে হয়ে উঠেছে অসাম্প্রদায়িক। ১১ সেপ্টেম্বরের ১৯ জন হাইজাকারের মধ্যে স্পষ্টতই বেশীর ভাগই ছিল সুশিক্ষিত, বয়ঃপ্রাপ্ত, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং এমনকি নগ্ন বারেও ছিল তাদের যাতায়াত। এদের কেউ কেউ ছিল বিবাহিত এবং অন্যদের ছিল মেয়েবন্ধু। আর প্রায় সবাই ছিল স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।

আত্মঘাতী বোমার ঘটনা যেমন সীমাবদ্ধ মাত্র আটটি দেশে সেরকম ৮৮ শতাংশ আত্মঘাতী বোমারুরা সবাই-ই মাত্র ৪টি গ্রুপের কোন একটির প্রতিনিধি হামাস (৫১ শতাংশ), লিবারেশন টাইগারস অব তামিল এলাম (২১ শতাংশ), পাকিস্তান ইসলামিক জেহাদ (৯ শতাংশ) এবং পিকেকে (৭ শতাংশ)।

বস্তুত বিভিন্ন সন্ত্রাসী দলই এক একটি প্রক্রিয়াতে বিশেষ অভিজ্ঞ। আমরা তাই দেখি হামাস এবং লিবারেশন টাইগারস অব তামিল এলাম ব্যবহার করেছে অনেক আত্মঘাতী বোমারু। অন্যদিকে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি এবং বাস্ক সেপারেশন গ্রুপ ব্যবহার করেছে গাড়ি বোমা, তাদের প্রায় ৬২ শতাংশ এবং ৭৬ শতাংশ আক্রমণে। ফিলিপিনো গ্রুপ আবু সায়াফ অব কলাম্বিয়ান রেবেল গ্রুপ FARC-র বিশেষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে kidnapping and hostage taking.

সব আত্মঘাতী বোমার ঘটনার দিকে তাকালে আরও যেটা চোখে পড়ে সে ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয় বরং সংঘবদ্ধ এবং ঘটছে কোন রাজনৈকিত প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে আত্মঘাতী বোমার ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লোকের তাৎক্ষণিক ইমোশনের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং এগুলো এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নেতৃত্বের strategic moves.

সত্যিকার, নেতারা সহজেই যখন চান তখনই আত্মঘাতী বোমাকে ব্যবহার করতে পারেন বলির পাঠা হিসেবে। অন্য একটা পৃথিবীকে নিয়ে Paranoid ধর্মীয় গোষ্ঠীর মত করেই এসব গোষ্ঠী তাদের মানব অস্ত্রগুলোকে সংগ্রহ করে। তবে হ্যাঁ আত্মঘাতী বোমার হামলায় নিহত এবং আহতের মোট সংখ্যা, ১১ সেপ্টেম্বর এর ঘটনাসহ নিলেও, আমেরিকাতে ২০০১ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১৪২১ মৃত্যু এবং ৪.৩ মিলিয়ন আহতের সংখ্যার মোটেও ধারে কাছে নয়।

আত্মঘাতী বোমার আসলেই কোন সামরিক মূল্য নেই। জাপানের আত্মঘাতী কামিকাজে পাইলটরা পারেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার নৌবাহিনীর অগ্রসর ঠেকাতে। তেমনি আত্মঘাতী বোমার ভয়ে পৃথিবী থেকে ইসরাইল মুছে যাবে তেমনও কোন সম্ভাবনা নেই।

আত্মঘাতী বোমার প্রতিটি ঘটনার ফলাফলের তুলনায় তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু অনেক বেশী ওজনদার। এ ধরনের নাটকীয় ঘটনায় গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের ওপরে সহজেই চোখ পড়ে পুরো পৃথিবীর আর ফলস্বরূপ দেশ বঞ্চিত হয় পর্যটন আর বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে। দ্বিতীয়ত, এরকম ঘটনা প্রতিবেশীদের মধ্যে জন্ম দেয় চরম অবিশ্বাসের। ফলত জন্ম হয় আরও ঘৃণার। তৃতীয়ত, এবং হয়ত বা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই যে এইরকম ঘটনার রাজনৈতিক শান্তি আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যায়। একটি চরমপন্থী ঘটনা সবদিকেই জন্ম দেয় আরও বেশী চরমপন্থীর। আরও চরম প্রতিক্রিয়া দেখানোর খেলা শুরু হয় যা ক্রমে ধ্বংস করে একটি সমাজকে।

মধ্যপ্রাচ্যে আজ মধ্যস্থতাকারী শান্তি আলোচনার ভূমি চরমভাবে আক্রান্ত সবদিক থেকেই। বুশ এডমিনিস্ট্রেশন নিজেদেরকে ক্লিনটন স্টাইল থেকে আলাদা করতে করতেই তালগোল পাকিয়েছে অনেক সম্ভাবনার। এই মুহূর্তে তাই তিন গোষ্ঠীর কারোরই শান্তির পথে কোন পরিকল্পনা নেই। শুধুমাত্র আরাফত এবং পিএলওকে বন্ধ করে ইসরাইল আত্মঘাতী বোমার মূল উপড়াতে পারবে না। আজ যদি পিএলও'র বিকল্প কেউ প্যালেস্টাইনের নেতৃত্বে আসে তা হবে আরও চরমপন্থী হামাস, পিআইজে অথবা নবগঠিত আল আকসা বিগ্রেড। প্যালেস্টাইন শুধুমাত্র এই ধরনের ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের স্বাধীন দেশের জন্ম দিতে পারবে না। আর আমাদের প্রেসিডেন্ট বুশও শান্তি আনতে পারবেন না মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রায় না থাকা পরিকল্পনার মাধ্যমে। ❑

অনুবাদ : শ্যামল নাথ

লেখক পরিচিতিঃ ডঃ দীপক গুপ্ত সান দিয়েগো স্টেইট ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক এবং ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এন্ড পলিটিক্যাল প্যাথলজির কো-ডিরেক্টর।

জর্ডান নদীর পশ্চিমে

শ্যামল নাথ

যদিও আমি ঐতিহাসিক নই, যদি আমরা এটাকে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে দীর্ঘতম সংঘাত হিসাবে চিহ্নিত করি মনে হয়না একটুও ভুল বলা হবে। আমি বলছি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাড় আর জর্ডান নদীর পশ্চিমের জমিটার কথা। কত লাশ পড়েছে এই জমিতে, আর এই জমির সৌজন্যে, তার হিসাব বোধহয় কেউই সঠিক করে বলতে পারবেন না। তবে মানব সম্প্রদায়ের দু'টি গোষ্ঠির ভেতরে যে কতটা পারস্পরিক ঘৃণা এবং বিদ্বেষ থাকা সম্ভব তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই এক একটা লাশ। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিদ্যমান এবং চলমান এই যুদ্ধ আর সংঘাতের ঘটনা দেখে আমার বিস্ময় জাগে। মাঝে নিজেকেই নিজের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে - জগৎ জড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি - একি সত্যি? নাকি, কালো আর সাদা, আর্য আর দ্রাবিড়, হিন্দু আর মুসলিম আর ইহুদী আমরা সবাই আসলে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি - প্রাকৃতিক বিবর্তণের নিয়মে একে অপরকে মেরে খুঁড়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায়ের সংগ্রামে লিপ্ত।

আজকে আমরা প্যালেস্টাইনী এবং ইসলাইলী যে দুটো পৃথক জাতি

স্বত্বাকে জানি, দু'হাজার বছর আগে, সংঘাত শুরুর পূর্বে কোন একদিন এদের জন্ম যে একই মায়ের পেটেই হয়েছিল সেটা এই মূহুর্তে সবাই বোধহয় প্রায় ভুলতে বসেছেন। জানি, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যার সংকল্প তার পেছন ফিরে তাকানোই ভুল, পাছে পা পিছলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তবু ওই দুটো প্রাচীনতম জাতি যদি আজ নিজেদের শিকড় সন্ধান করে পরস্পরকে এতটুকুই চিনে নেবার চেষ্টা করতে পারত, হয়তবা এতো সংঘাত আর ঘৃণার মাঝেও নতুন করে আত্মিয়তা খুঁজে পাবার সুযোগ একটা আসতেও পারত।

সংঘাতটা কেন, এর উৎস কোথায়। এ জমিটাতে আসলে অধিকার কার। কে বাদী আর কে বিবাদী। কে শান্তি চায়, আর কে শয়তান। দুহাজার বছরের জঞ্জাল খুঁড়ে এর উত্তর বের করতে পারব, সেটা দুরাশা। যদি বলি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব-সেটাও হয়তো একটু বেশীই বলা হবে। কারণ, মানুষ আসলে মত প্রকাশ করলেই একটা পক্ষপাতে চলে যায়। তবুও চলুন দেখি যদি এইটুকু বুঝার চেষ্টা করতে পারি যে মানুষ হিসাবে এই সংঘাত বন্ধ করতে আমাদের কিছু কি করণীয় আছে? নিদেন পক্ষে, আমরা কি নিজেদেরই অজান্তে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করছি?

যদি আজকের নতুন দিনের ইসলাইলকে বাদ দেই, ইসরাইলী ইহুদীদের নিজেদের রাজ্যের অস্বিত্ব ১৩৩ শতাব্দির পরে আর ছিল না। পৃথিবীর বুকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের পবিত্রভূমি জেরুজালেম এবং তৎসংলগ্ন এলাকা। আরবের মরুভূমির বুকে একে একে নবী এসেছেন নতুন নতুন ধর্মের বাণী নিয়ে। ধর্মীয় ধারাবাহিকতায় প্রথম এসেছে ইহুদীবাদ, তারপরে খৃষ্টীয়ানিটি, আর সর্বশেষে ইসলাম। একই ভূমির বুকে, একই শিকড়ে গাঁথা মানুষের মধ্যে নতুন নতুন ধর্মের বানী নিয়ে মহামানবদের আবির্ভাব হলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের সুতো ধরে এ অঞ্চলের মানুষের জাতীয়বাদ তীব্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বারে বারে। আমাদের প্রাচীন সমাজ ব্যাবস্থায় ধর্মের আসন ছিল মানুষ এবং তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যকার যোগাযোগের সীমা ছাড়িয়ে অনেক বেশী ব্যাপ্তি নিয়ে। ধর্মগ্রন্থ ছিল সমাজ ব্যাবস্থা আর বিচার ব্যাবস্থার অবিধান। ধর্মীয় যাজকরা ছিলেন মহাপুরুষের আসনে অধীন- একাধারে শিক্ষক, বিচারক, সমাজপতি এবং অনেক ক্ষেত্রেই শাসনকর্তা। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলস্বরূপ নতুন ধর্মের আগমন যে শুধু মানুষের জাতীয়তাবাদকে বিচ্ছিন্ন করেছে তাই নয়, পাশাপাশি এইসব অতি মানব শাসনকর্তাদের নিজ নিজ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষে মানুষে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রচন্ড ঘৃণা। যেহেতু ধর্মীয় গুরুরাই ছিলেন রাজ্যের অধিকর্তা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়ে যায় দুই ধর্মের ষাড়ের লড়াই - অমরা সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্য এবং সংলগ্ন ইউরোপে প্রচুর ধর্মযুদ্ধের ঘটনা দেখতে পাই। ধর্মযুদ্ধ কি আসলেই কখনো কোন দুটো ধর্মের মধ্যে লড়াই? ধর্মতো কখনো ময়দানে যুদ্ধ করতে নামে না। শুধু ধর্মের নামে উচ্চাভিলাষী রাজনৈতীকরাই ময়দানে নামায় গোবেচোরা নিরিহ মানুষদের।

বলছিলাম প্রাচীন কালের শেষ ইহুদী রাজ্যের কথা। খৃষ্টজন্মের আসেপাশের সময়টাতে ইহুদীরাজ্য এবং তার জনগণ নানাভাবে যুদ্ধে জড়িয়েছে বিভিন্ন খৃষ্টান রাজা, রাজ্য এবং জাতির সাথে। খৃষ্টপূর্ব ৭০ সালের রোমান রাজ্য প্যালাস্টাইনের অংশছিল শেষ ইহুদী বসতি 'জুডেয়া'। ১৩৩ খৃষ্টব্দের রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ানার শাসনআমলে ইহুদীরা বিদ্রোহের চেষ্টা করলে শেষ বারের মতো ইহুদীরা বিতাড়িত হয় তাদের মাতৃভূমি জেরুজালেম থেকে। রোমান সম্রাট ইহুদীদেরকে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয় আরব এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। ইসরাইল বা প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের এর পরের ইতিহাস ধর্মীয় বা জাতি হিসাবে নয়, বরং ব্যক্তি মানুষ হিসাবে তাদের বেঁচে থাকার ইতিহাস। যদিও ধর্ম এবং জাতীয়তা এক জিনিষ নয়। উনিশের দশকের শেষ অবধি ইউরোপের আনাচে কানাচে ইহুদী সম্প্রদায়ের যেসব মানষ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে তাদের সবার শিকড় এই জায়গায় গাঁথা। তাই এই লিখাতে আমি ইহুদী বলতে ধর্মের গন্ডির বাইরে এই জাতিকেই বোঝাব সময়ে অসময়ে। ইহুদীদের যেই বিষয়টা আমাকে সবচাইতে বিস্মিত করে তা হচ্ছে, বিপুল মহিমায় ইউরোপে তাদের অস্তিত্ব জিয়িয়ে রাখা। যে ইউরোপে দাস হিসাবে এদের বেশিরভাগেরই আগমন, তাদেরকে আমরা দেখি এই শতাব্দীর গোড়াতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ব্যাবসা বাণিজ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক এবং বাহক হিসাবে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে আস্তে আস্তে 'ইহুদী খেদাও' ধারণা জোরদার হতে শুরু করে। আধুনিক বিশ্বেও আবার সেই ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতকি ব্যাবহার। মানুষের ইতিহাসে বরাবর যা হয়- ব্যাক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্যে দূর্বল সংখ্যালঘুদের উপরে সবলের অত্যাচার। ইহুদীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার চরম ফলাফল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং নাৎসী বর্বরতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইহুদী ধ্বংসজজ্ঞে মৃত্যুবরণ করে প্রায় ষাট লক্ষ ইহুদী। আমরা সাধারণ মানুষ কত সহজে রাজনৈতিক শাক্তির হাতের পুতুল বনে যাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ জার্মানী, হিটলার এবং তার নাৎসী বাহিনী। 'জার্মানের ইহুদী বসতি এবং তাদের উন্নতি জার্মানের খাঁটি আর্যদের অস্তিত্বের হুমকী'- শুধু এই আফিম দিয়েই হিটলার গোটা জার্মানের খৃষ্টান সম্প্রদায়কে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছিল কত সহজে।

এই তো গেল এই শতাব্দীর আগ অবধি ইহুদী এবং ইসরাইলীদের ইতিহাস -এক ঝলকে। এবার একটু সেই জমিটার খাবর নেয়া যাক। ইহুদীদের যদিও জেরুজালেম এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে তাড়িয়েছিল তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্য, ছয়শত শতাব্দীতে ইসলামের স্বর্ণযুগে ঐ এলাকা ইসলামী শাষনের আওতায় চলে আসে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর অষ্টম শতাব্দীতে জেরুজালেমে নির্মান করেন বিখ্যাত আল-আকসা মসজিদ। জেরুজালেম হয়ে উঠে ইসলামেরও এক ঐশ্বর্যমন্ডিত পিঠস্থান। বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে একছত্রভাবে গড়ে উঠে আরব বসতি আর তার শাসনকর্তা ছিলেন বিভিন্ন মুসলিম সম্রাট।

এই শতাব্দীর গোড়াতেই জর্ডান নদীর পশ্চিমের এই জমি, আজকের ইসরাইল আর প্যালেস্টাইনকে নিয়ে শুরু হয় নতুন রাজনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের তৎকালীন শাসনকর্তা তার্কিশ সম্রাট অটোম্যান পরাজিত হয় আরব এবং ব্রিটিশ যৌথ বাহিনীর হাতে। বৃটেন তখনো দেশে দেশে তার কলোনীয়াল সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যস্ত থাকায় স্বাভাবতই তার্কিশ সম্রাটের পতনের পর প্যালেস্টাইন চলে আসে বৃটিশ শাসনের আওতায়, ১৯২০ সালে। আগেই বলেছি এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই গোটা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে 'ইহুদী খেদাও'। দুভাগ্যজনক ভাবে যদিও ইহুদী খেদাও ছিল মূলত মধ্য-ইউরোপের সমস্যা, বৃটেনও পরোক্ষভাবে যোগ দেয় সেই আন্দোলনে। আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে গোটা ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি এই বৈমাত্রেয়সূলভ আচরণ সত্যিই কলঙ্কজনক। একটা পাশাপাশি তুলনা দেবার চেষ্টা করি- আমেরিকাতে কালোদের আগমন দাস হিসাবে, যেরকম ইউরোপে ইহুদীদের। আজ যদি গোটা আমেরিকা জুড়ে এই রব উঠে যে কালোদের স্থান আমেরিকাতে নয় আফ্রিকায় - ইউরোপের ইহুদী খেদাও মূলত তারই সমতুল্য। ইউরোপের বৈমাত্রেয়সূলভ আচরণের সূত্র ধরেই ইহুদীরা এক জোট হয়ে একটি ইহুদী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করে। ইহুদী সাংবাদিক থিউডোর হেজাল এর স্বপ্নের 'ইহুদী রাষ্ট্রের' বানী সোচ্চারে প্রথম ধ্বনিত হয় ১৮৯৬ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে অনুষ্ঠিত প্রথম জিওনিষ্ট কংগ্রেসে। ইহুদীদের স্বপ্নের সেই রাষ্ট্রের স্থান ভূমধ্যসাগরের পূর্বে আর জর্ডান নদীর পশ্চিমের সেই জমিটা। ইউরোপ থেকে ঠিক সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে কিছু ইহুদী মাইগ্রেট করতে শুরু করে প্যালেস্টাইনের দিকে। একটি সূত্র মতে তার্কিশ সম্রাটের শাসন আমলেই ১৮৯৭ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ ইহুদী প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে। বৃটেন যখন প্যালেস্টাইনের শাসনভার নিজেদের হাতে পায় সেটা বৃটেনকে ইউরোপের ইহুদী সমস্যা মোকাবেলায় একটা অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। 'কাটা দিয়ে কাটা তোলা', মাছের তেলে মাছ ভাজা', নাকি

‘পরের মাথায় লবন রেখে বড়ই খাওয়া’-এর কোন বিশেষণটা যে বৃটেনের জন্যে সবচাইতে বেশী প্রযোজ্য তাই ভাবছি। একদিকে ইউরোপের ইহুদীদেরকে তাদের স্বপ্নের রাজ্যে উৎসাহিত করা, বাদবাকি ইউরোপের তাদের ইহুদী খেদাও সফল করতে ইউরোপ থেকে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে মাইগ্রেট করা, আর সবশেষে প্যালেস্টাইনে বৃটিশ শানকার্য সহজ করার জন্যে প্রজাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকট বাড়ানো- এক ঢিলে এই তিন পাখি মারার সূবর্ণ সুযোগ তখন চলে আসে বৃটেনের কাছে। আবার সেই একই খেলা, উলো খাগড়ার প্রান দিয়ে রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্য সফল করা।

এটা যতই পরিষ্কার যে ইউরোপ থেকে ইহুদীদের তৎকালীন প্যালেস্টাইনে আসতে উৎসাহিত করার পেছনে পুরোটাই ছিল বৃটেন তথা ইউরোপের স্বার্থ - ইহুদীদের জন্যে বৈমাত্রেয় ইউরোপ ছেড়ে স্বপ্নের ইহুদী রাজ্যে পূনর্বাসনের ইচ্ছাটিকে কি কোনভাবে ছোট করে দেখা যায়? ওদের নতুন ভুমি যদি ওদের তাড়িয়ে দেয় ওরা তো ওদের আদি ভূমিতেই আস্তানা গাড়ার কথা ভাববে, নয় কি?

উনিশ শতকের গোড়াতে যেখানে প্যালেস্টাইন ছিল আরব অধ্যুষিত মুসলমান প্রধান দেশ, ১৯২২ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদী বসতি দাঁড়ায় দেশের জনসংখ্যার শতকারা এগার শতাংশে। দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাঝে ইউরোপ থেকে ইহুদীদের ঢল প্যালেস্টাইনে আসতে আসতে ১৯৪৭ সালে সেখানকার ইহুদী বসতি দাড়ায় মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইউরোপে ইহুদী নিধনযজ্ঞ চরমে উঠলে ইউরোপ থেকে প্যালেস্টাইনমুখী ইহুদীদের জোয়ারও বাড়তে থাকে। ইহুদীদের জন্যে দুঃখজনক এটাই যে বৈমাত্রেয় ইউরোপ ছেড়ে ওরা যেখানে পাড়ি জমাচ্ছিল সেটাও তাদের জন্য এমন কোন বিশেষ মাতৃসুলভ ছিল না। গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আরবের মুসলমানদের সাথে ইসরাইলী ইহুদীদের সম্পর্ক সাপে-নেউলে। ইহুদী রাজ্য জুড়েয়া থেকে তাদের বিতাড়িত হবার পর থেকে এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্যন্ত আরবে ইহুদীরা বেঁচে ছিল মূলত দাস হিসেবে। তৎকালীন প্যালেস্টাইনের শাসন কর্তা বৃটেন, যারা ইহুদীদের জন্যে প্যালেস্টাইনের দরজা খুলে দিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হয়েছে ভালভাবেই সেটা বলা যায়। প্যালেস্টাইনে ইহুদী বসতি বাড়তে থাকলে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও বাড়তে থাকে প্রত্যাশিত ভাবেই। মুসলিম এবং ইহুদীদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সংকটের মুখে ১৯৩৭ সালে বৃটেন প্রথম এই অঞ্চলটিকে বিভক্ত করে দুটি পৃথক রাজ্য নির্মাণের প্রস্তাব করে- একটি ইহুদীদের আর একটি মুসলমানদের। ইহুদীদের চোখে তখন নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতছানি, তরা এই প্রস্তাবকে সমর্থণ করে। প্যালেস্টাইনের মুসলিম এবং মধ্যপ্রাচ্যের গোটা আরব সম্প্রদায় প্রস্তাবটি প্রত্যাক্ষান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে এই অঞ্চলে ইহুদী-মুসলমানদের সংকট উত্তোরত্তর বাড়তে থাকলে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চলটিকে দুটো পৃথক ইহুদী এবং মুসলিম রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। আবারও ইহুদীরা এই প্রস্তাব সমর্থণ করে এবং প্যালেস্টাইনী মুসলিম এবং বাকী মধ্যপ্রাচ্যের আরব সমাজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। জাতি সংঘের প্রস্তাব প্রত্যাখিত হয়ে বাস্তবায়ন না হলে দুপক্ষের মাঝে রিতিমতো যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এরই মাঝে বৃটেন সরকার ১৯৪৮ সালের ১৫ মে প্যালেস্টাইনে তাদের শাসন কালের অবসান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। বৃটিশ রাজত্বের অবসানের ঘোষণা এই অঞ্চলে যুদ্ধাবস্তাকে আরও তীব্র করে তোলে। মুসলিম এবং ইহুদী প্রধান অঞ্চলে নিজ নিজ সৈন্যরা সীমান্ত বাড়ানো এবং রক্ষার জন্যে তৈরী হতে থাকে। যদিও প্যালেস্টাইনী মুসলমানদের পিছনে ছিল পুরো আরব বিশ্বের সমর্থণ, তাদের নিজস্ব নেতৃত্বের দূর্বলতার জন্যে ১৯৪৮ সালের মে মাসে কোন স্বাধীন প্যালেস্টাইনের জন্ম হয়নি। প্যালেস্টাইনের ইহুদী প্রধান অঞ্চল নিয়ে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ঘোষিত হয় ইসরাইলের জন্ম। শুরু হয় আধুনিক কালের ইসরাইল-প্যালেস্টাইন সংকট।

এখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাই- যদি মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপের মাটি কোনটাই ইহুদীদের জন্য স্বদেশ না হবে, তবে তারা কোথায় যাবে? বৃটেন তথা ইউরোপ তাদের নিজের ইহুদী সংকটকে চালান করে দিল মধ্যপ্রাচ্যে আর তৈরী করল মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদী-আরব সংকট, সেজন্যে কি ইহুদীদের তথা ইসলাাইলকে দায়ী করা চলে? প্যালেস্টাইনের মাটিতে যেখানে গত দেড়হাজার বছর ধরে বাস করে আসছে মূলতঃ আরবের মুসলিমরা সেখানে হঠাৎ করে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করাটা কি আরব মুসলমানদের জন্যে সহজেই মেনে সম্ভব ছিল? প্রশ্নগুলো পরস্পর বিরোধী, আসলে সেটাই তো আজকে সংকটের একটা মূল কারণ। এর সাথে শেষ যে প্রশ্নটা জুড়ে দিতে চাই তা হচ্ছে - কোন সমাধান কি সম্ভব?

আমি বিশ্বাস করি মানুষ হিসাবে পৃথিবীর বুকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে প্রতিটি প্যালেস্টাইনী এবং ইসরাইলী নাগরিকের। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা। স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ খুবই জটিল, পৃথিবীর দেশে দেশে রাজায় রাজায় ঠোকাঠুকি এবং মোলাকাত আর তার পাশাপাশি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের সীমানা, সঙ্গায়িত হয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা। প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বাধীনতা হচ্ছে একটি মুক্ত জীবনের অনুভূতি। শুধু নিজের জন্যেই নয়, স্বাধীনতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পাশের লোকটির স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করতে পারা। প্রশ্ন হচ্ছে প্যালেস্টাইন আর ইসরাইলের নাগরিকদের পক্ষে কি পারস্পরিক স্বাধীনতাকে সম্মান করে পাশাপাশি অবস্থান করা সম্ভব? যদি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির কথা বলি তাহলে চোখ বুজে বলে দেয়া চলে এটাই হচ্ছে তার প্রথম শর্ত। যদি বাস্তবের দিকে তাকাই মনে সংশয় জাগে প্রচুর।

১৯৪৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গোটা আরব বিশ্বে একমাত্র মিসর ইসরাইলকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। সংশয়ের কথা বলছিলাম সেজন্যই। গোটা আরব বিশ্ব কি কখনো মধপ্রাচ্যের মাটিতে স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারবে? আগেও বলেছি এবং আবারও আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে, যে মাটিতে আরবের মুসলমানরাই বাস করে আসছিল হাজার বছর ধরে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদীর প্রত্যাবর্তণ এবং তাদের স্বাধীন দেশের ঘোষণা মেনে নেয়া আরবদের পক্ষে এত সহজ নয়। কিন্তু এটা মানতে কি কোন বাধা থাকা উচিত যে ইহুদীরাও মানুষ এবং তাদেরও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আজকের দিনের বাস্তবতায় ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের জন্মের পরে পঞ্চাশ বছরের বেশী পেরিয়ে গেছে। আজকের ইহুদী এবং প্যালেস্টাইন যুবকদের কারোই জন্মও হয়নি ১৯৪৮ সালে। খুব সহসাই পুরো ইসরাইলের সব নাগরিক হয়ে উঠবে জন্মসুত্রে মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিক। সময় কি হয়ে আসছে না তাদের জন্মভূমিতে তাদের অধিকার স্বীকার করে নেয়ার।

এ তো গেল এক দিকের খবর। ১৯৪৮ সালে যখন মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষিত হল তখন যে আরব বিশ্বের একটি দেশও তাতে স্বীকৃতি দেবে না, সেটাই স্বাভাবিক। মানুষ কখনোই এত সহজে তার নিজের অধিকার খর্ব করে তা অপরের হাতে তুলে দেয় না। বৃটেনের স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের পরে জর্ডান নদীর পশ্চিমের এই ভূখন্ডে স্বাধীন প্যালেস্টাইন হবে আর তাতে ইহুদীরা সংখ্যালঘু হিসাবে অবস্থান করবে - প্যালেস্টাইনের এই ইচ্ছাটুকুর মধ্যে কোন উচ্চাভিলাষ ছিল বলে আমি মনে করি না। প্যালেস্টাইনীদের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি, তাদের এই জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসরাইল। ইসরাইলের জন্মের প্রথম দিন থেকেই তাকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে আরব বিশ্ব এবং প্যালেস্টাইন সংগত চিন্তা থেকেই। শুরুর দিকের আরব বিশ্বের প্রবল প্রতিরোধকে সামলে নিয়ে ঠিকঠাক দাড়িয়ে গেছে ইসরাইল। সংশয়ের কথায় ফিরে আসি। এখন সময়টা ১৯৪৮ নয়, ২০০২। আজ ইসরাইল স্বাধীন দেশ আর প্যালেস্টাইনীরা সেদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সময় কি আসেনি প্যালেষ্টাইনীদেরকে স্বাধীন দেশে বেচে থাকার অধিকার ফিরিয়ে দেবার? ইসরাইল এবং তার জনগণ যদি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তাহলে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কবে আসবে

তাদের মাঝে?

১৯৪৭ সালে যখন জাতিসংঘ তৎকালীন বৃটিশ শাষিত প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে আরব এবং ইহুদী অধ্যুষিত দুটি দেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব করে। সে মুহুর্তে প্যালেস্টাইন কোন সংগঠিত নেতৃত্বের পেছনে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। গোটা আরব বিশ্ব এবং প্যালেস্টাইন শুধু একটি ব্যাপারেই একমতে ছিল, যে কোন মূল্যে ইসরাইলকে উৎখাত করা। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে এটাই যে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে সেই আন্দোলনও কোন ঐক্যবদ্ধ আরব আন্দোলন ছিল না। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত জাতি হিসাবে প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধিত্বকারী কোন সংগঠন বা সংগঠক ছিল না। একটি দেশ বা জাতিকে স্বাধীন করা কঠিন কাজ। কিন্তু একটি দেশ বা জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারা তার চাইতেও অনেক বেশী কঠিনতম। কথাগুলো আমার নয়, কোন এক মনিষীর। মনে প্রশ্ন জাগে, ১৯৪৮ সালে যদি স্বাধীন প্যালেস্টাইনের জন্মও হত তাহলে তাকে ধরে রাখবার মত প্রতিনিধিত্বকারী প্যালেস্টাইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কি জন্ম হত? প্রশ্নটা করছি একারণেই - ১৯৪৮ সালে কোন স্বাধীন প্যালেস্টাইনের (তা খন্ডিত হউক বা অখন্ডই হউক) জন্ম না হবার পেছনে বৃটেন, আমেরিকা এবং ইসরাইলের পাশাপাশি প্যালেস্টাইনীদের নিজেদের নেতৃত্বহীনতাও কি অনেকাংশে দায়ী নয়? ১৯৬৪ সালে আরব দেশ সমূহের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন (পিএলও)। পিএলও'র নেতৃত্ব নিয়েও আরব দেশসমূহের মাঝে রাজনীতি চলছে অনেক। পিএলও প্রথম প্যালেষ্টাইনী জনগণের মুখপত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালে যখন ইয়াসির আরাফাত নির্বাচিত হন তার চেয়ারম্যান হিসেবে। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনের হয়ে যুদ্ধগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে হয় কোন পার্শ্ববর্তী আরব দেশ অথবা কোন বিচ্ছিন্ন প্যালেস্টাইনী গেরিলা বাহিনী। পিএরও'র প্রতিষ্ঠা এবং তার কর্মকাণ্ডও প্রথমত পরিচালিত ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অখন্ড প্যালেস্টাইনে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

ইসরাইল যে আজ অখন্ড প্যালেস্টাইনকে শাসন করে তাই নয়, সময়ে সময়ে প্যালেস্টাইন অধ্যুশিত অঞ্চলগুলোতে ইহুদী বসতি স্থাপন করার কাজ তারা চালিয়েছে বিগত বছরগুলোতে। দুঃখজনক এটাই যে ইসরাইলেও কট্টরপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতীক শক্তি বেশ প্রবল যারা দেখতে চায় বাইবেল যুগের সেই ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা, যার বিস্তৃতি আজকের ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের সীমানাসহ জর্ডানের কিছু এলাকা জুড়ে। ইসরাইল শাষিত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ইহুদী বসতি স্থাপনা এই কট্টরপন্থী রাজনৈতিক শক্তিরই সাফল্য। পাশাপাশি আরও দুঃখজনক এই যে, প্যালেস্টাইনী গেরিলাবাহীনি এবং আরববিশ্ব যতই ইসরাইলের বিরুদ্ধে ইসরাইল উৎখাত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, ইসরাইলের ভেতরের কট্টরপন্থী রাজনৈতিক শক্তিও আরও বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং উঠবে।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইহুদী সংকটের আরও একটি দিক যেটা খুবই বিব্রুতকর তা হচ্ছে - যেসব আরব অথবা ইহুদী নেতৃত্ব উদারতার পথে গিয়ে শান্তির চেষ্টা করেছেন তারাই নিহত হয়েছেন নিজেদের দিকের কট্টরপন্থীদের দ্বারা। মানুষে-মনুষে, জাতিতে-জাতিতে কত ঘৃণা জমে থাকলে তারা শান্তিবাদিদের ঘাড় থেকে নির্দ্বিধায় মাথাটা নামিয়ে দিতে পারে? ১৯৭৭ সালে তৎকালীন মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত প্রথম ইসরাইলের বিরুদ্ধে অস্ত্রের পথ বাদ দিয়ে শান্তির পথে সমাধানের দিকে এগিয়ে যান। মিসর ইসরাইলকে স্বীকার করে নেয় এবং প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রথম আরব নেতা হিসেবে ইসরাইলী পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেন। মিশর এবং ইসরাইল পারস্পরিক সীমানার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজেদের সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয় নিজেদের অঞ্চলে। আরব নেতার ইসরাইলকে স্বীকার করে নেবার উদারতার ফলস্বরূপ ইসরাইল প্যালেস্টাইনীদের জন্য স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে মিশরের সাথে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির একটি খসড়া চুক্তিও স্বাক্ষর করে। দুঃখজনকভাবে, মিশরের এই উদ্যোগকে আর একটি আরব রাষ্ট্রও সমর্থন করেনি এবং তরা মিশরেকে আরব বিশ্ব থেকে একঘরে করে দেয়। ১৯৮১ সালে ইসরাইলের সাথে শান্তি উদ্যোগের ৪ বছরের মাথায় মিশর সেনাবাহিনীর ইসলামী কট্টরপন্থীদের হাতে প্রাণ হারান প্রেসিডেন্ট সাদাত।

ইসরাইলী দিক থেকে আরব-ইসরাইল শান্তি উদ্যোগ সবচাইতে সফল ছিল ১৯৯২ সালে বামপন্থী লেবার পার্টি যখন ইসরাইলে ক্ষমতায় আসে। তৎকালীন ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এইজ্যাক রবীন পিএলও প্রতিনিধিদের সাথে শান্তি আলোচনা এবং সংকট সমাধানে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসেন। ১৯৯৩ সালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় নরওয়ের ওসলোতে প্রথম সফল ইসরাইল-প্যালেস্টাইন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন হয়। প্যালেস্টাইনীরা ইসরাইলকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করে নেয় এবং বিনিময়ে ইসরাইল তার প্যালেস্টাইন অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে সৈন্য প্রত্যাহার করে প্যালেস্টাইনীদের জন্যে স্বায়ত্বশাসনের অংগীকার করে। এখানে উলে-খ করা প্রয়োজন যে ১৯৮৮ সালে আলজেরিয়াতে অনুষ্ঠিত প্যালেস্টাইনী ন্যাশনাল কাউন্সিল জাতিসংঘ প্রস্তাবিত (১৯৪৭ সালে) দুই দেশের সমাধান মেনে নিয়ে ইসরাইল-প্যালেস্টাইনের মধ্যকার সন্ত্রসীযুদ্ধ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করে। ওসলো শান্তি প্রস্তাবের সুত্র ধরে ১৯১৪ সালে ইসরাইল ধীরে ধীরে প্যালেস্টাইন অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে তার সৈন্য সরিয়ে নেয়া শুরু করে এবং এসব অঞ্চলে প্যালেস্টাইনী লিবারেশন আর্মী তাদের স্থান দখল করতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালেস্টাইনী সায়ত্বশাসনের জন্যে প্যালেস্টাইনীয়ান ন্যাশনাল অথরিটি এবং আরাফাত তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ১৯৯৬ সালে। আবারও দুইপক্ষের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক এবং সন্ত্রাসী বাহিনী শান্তিতে আঘাত হানে। সায়ত্বশাষিত প্যালেস্টাইনে সংকট জিয়িয়ে রাখে সেখানকার বিভিন্ন প্যালেস্টাইনী গেরিলা বাহিনী যারা ইসরাইলকে স্বীকার করতে চায় না। ইসরাইলীদের ক্রমবর্ধমান শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে থাকে তাদের কট্টরপন্থী রাজনৈতকি শক্তির তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে। যারা চায় বাইবেল আমলের ইসরাইলী ভূখন্ড। ১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর এইজ্যাক রবীন প্রান হারান ইহুদী কট্টরপন্থী সাম্প্রাদায়িক গ্রুপের হাতে।

পাঠককে এখানে এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে আমি অনেক ছোট খাট সূক্ষ্ম ডিটেইলস বাদ দিয়ে গেছি। কিন্তু, সত্য এই যে দুদিকেই যখন কেউই শান্তির কথা বলছে অথবা শান্তির পথ ধরছে অন্য হাজারো সাম্প্রদায়িক শক্তি তাদের গলা টিপতে এগিয়ে আসছে। আজকে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করা আর ইসরাইলকে পৃথিবীর মাটি থেকে উৎখাত করার জন্য জন্ম হয়েছে হাজারো আন্তর্জাতিক গেরিলা বাহিনী। আল-কায়দা আজ নিউইয়র্কের ওয়াল্ড ট্রেইড সেন্টারে উড়োজাহাজ ঢুকিয়ে স্বাধীন করতে চায় প্যালেস্টাইন। অথবা হামাস গ্রুপের লোকজন ইসরাইলের বিভিন্ন শহরের কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিচ্ছে প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করার জন্যে। সত্যিই কি এভাবে প্যালেস্টাইনী জনগণের স্বাধীনতা আনা সম্ভব? ইসরাইলে আজ ক্ষমতাশীন কট্টরপন্থী রাজনৈতিক শক্তির প্রতিনিধিরা যারা পিএলও বা প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল অথরিটিকে চিহ্নিত করে সন্ত্রাসী হিসাবে আর তাই শান্তি বৈঠকের বদলে তারা পাঠায় সন্ত্রাস দমনে তাদের সেনাবাহিনীকে। আপনি বা আমি যারা এই মধ্যপ্রাচ্য সংকটে ইসরাইল বা প্যালেস্টাইনকে সমর্থন করি, একটু ভেবে দেখা দরকার আমরা আসলে কাকে সমর্থন করি। আরব বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক, আন্তর্জাতিক ইসলামী গেরিলা গোষ্ঠী, প্যালেস্টাইনী বিভিন্ন গেরিলাবাহিনী আর প্যালেস্টাইনী জনগণ সবার স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। তেমনি ইসরাইলী জনগণ তাদের কট্টরপন্থী ধর্মীয় আর রাজনৈতিক শক্তি, তাদের প্রশাসন আর তাদের আন্তর্জাতিক সমর্থক তাদেরও সবার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। একজন ইসরাইলী আর একজন প্যালেস্টাইনী নাগরিকের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বার্থের মধ্যে কোন বিভেদ নেই - কিন্তু ওদের কথা কি আসলেই কেউ ভাবছে? ❑

সান দিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া